বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-দর্শনের নিরিখে

বঙ্গবন্ধু ‘বেঁচে থাকলে’ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ আজ কোথায় দাঁড়াতো?

আবুল বারকাত*

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৯তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ২০১৫-তে পঠিত প্রবন্ধ।
সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য “রাজনৈতিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন পুনর্ভাবনা”
(“Rethinking Political Economy and Development”)

ঢাকা: ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, ৮-১০ জানুয়ারি ২০১৫।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-দর্শনের নিরিখে বঙ্গবন্ধু ‘বেঁচে থাকলে’ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ আজ কোথায় দাঁড়াতো? এ প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত-নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াসই এ লেখাটির প্রধান উপজীব্য। এ প্রশ্নের সহজ-সরল উত্তর দেয়া সোজা কথা নয়। সে কারণেই সামুহিক ও সমগ্রতার দৃষ্টিতে (holistic view) বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু জরুরি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির বর্ণনা-ব্যাখা-বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। মূল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইমেইল: info@hdrc-bd.com, hdrc.bd@gmail.com. এ প্রবন্ধের মূল অংশসমূহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক “গৌরবময় পথচলার ৬৫ বছর” শীর্ষক সংকলন গ্রন্থে প্রকাশ অপেক্ষমান। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ঊনবিংশতম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য “রাজনৈতিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন পুনর্ভাবনা” শিরোনামের সাথে সারার্থগত সাযুজ্যের কারণে প্রবন্ধটি ঈষৎ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে উপস্থাপিত হলো।

পরস্পর সম্পর্কিত ও যুক্তি পরম্পরা রক্ষার স্বার্থে প্রবন্ধটিকে নিম্নলিখিত মোট ছয়টি অনুচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। অনুচ্ছেদগুলি যথাক্রমে নিম্নরূপ: যে ইতিহাস না জানলেই নয় (অনুচ্ছেদ ১); দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু কি চেয়েছিলেন, কি ছিলো তার উন্নয়ন-দর্শন? আর হলোটা কি? (অনুচ্ছেদ ২); যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি ও সমাজে ক্ষয়-ক্ষতির ধরন অনুযায়ী পরিমাণ, মাত্রা ও প্রভাব-অভিঘাত: একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (অনুচ্ছেদ ৩); বঙ্গবন্ধুর ১৩১৪ দিন: যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি ও সমাজের গঠন-পুনঃগঠন, পুনর্বাসন, নির্মাণ-পুনঃনির্মাণসহ 'সোনার বাংলার' ভিত গঠনে বঙ্গবন্ধু কি করলেন? (অনুচ্ছেদ ৪); বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কতদূর যেতো? (অনুচ্ছেদ ৫); এবং সর্বশেষ– তা হলে মূল কথা যা দাঁড়ালো: উপসংহার (অনুচ্ছেদ ৬)।

১। যে ইতিহাস না জানলেই নয়

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো? এ কোন সহজ প্রশ্ন নয়। তবে ঐতিহাসিক কারণেই এ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া এবং সেই সাথে এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরও অনুসন্ধান যুক্তিযুক্ত। পাকিস্তানের সেনা-শাসিত, সামন্তবাদী, নয়া-ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থানের কারণে এ প্রশ্ন উত্থাপনের কয়েকটি সহজ সরল বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি আছে। এসব যুক্তির মর্মবস্তু এরকম: **যেহেতু** পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষাকারী এক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ২৩ বছরে (১৯৪৭-১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানে আমরা ছিলাম চরম-নিরন্তর বৈষম্যের শিকার[১] যে বৈষম্যের বর্তমান অর্থমূল্য হবে কমপক্ষে ১২ লক্ষ কোটি টাকা[২]; **যেহেতু** পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যায় আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলাম (পূর্ব পাকিস্তানে আমরা ছিলাম পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৩%) এবং সে কারণেও বৈষম্যের উচ্ছেদ চেয়েছিলাম; **যেহেতু** বৈষম্য নিরসনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রতিবাদের কারণে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রতিনিয়ত জেল-জুলুম-হুলিয়াসহ সব ধরনের অন্যায়-অন্যায্য-অগণতান্ত্রিক আচরণের শিকার ছিলেন; **যেহেতু** আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি চেয়েছিলাম; **যেহেতু** ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করার পরেও আমাদেরকে সরকার গঠনে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হলো, টিকতে দেয়া হলো না; **যেহেতু** ১৯৫৮ সালে সামরিক স্বৈরাচার ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদেরকে ১০ বছর গোলাম বানিয়ে রাখলেন; **যেহেতু** আমাদের গণআন্দোলনের কারণে আইয়ুব শাহি পতনের পরে অধিকতর বেঈমান জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা নিয়ে তারই দেয়া জনগণের হাতে ক্ষমতা অর্পণসহ শাসনতন্ত্র দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরবর্তীকালে ঐ প্রতিশ্রুতির ঠিক উল্টোটা করে ১৯৭১-এর পয়লা মার্চ গণপরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন; **যেহেতু** আমরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানকে ফেডারেল সরকারের অঙ্গরাজ্য[৩]

---

[১] পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে দুই অর্থনীতির এই বৈষম্যের সাধারণ রূপ নিয়ে ১৯৬৬ সালে "সোনার বাংলা শ্মশান কেন(?)" শিরোনামে যে প্রচারপত্র পূর্ব পাকিস্তানে বিলি করা হয়েছিলো সেখানে স্পষ্ট লেখা ছিলো: রাজস্ব খাতের মোট বার্ষিক ব্যয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে ৫,০০০ কোটি টাকা আর পূর্ব পাকিস্তানে ১,৫০০ কোটি টাকা, উন্নয়ন খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের বরাদ্দ ছিল ৬,০০০ কোটি টাকা আর পূর্ব পাকিস্তানে ৩,০০০ কোটি টাকা, মোট বৈদেশিক সাহায্যের ৮০ শতাংশ পেতো পশ্চিম পাকিস্তান আর বাকী মাত্র ২০ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তান, বৈদেশিক মুদ্রা আমদানীতে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ ছিলো ৭৫ শতাংশ আর পূর্ব পাকিস্তানের ২৫ শতাংশ, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অংশ ছিল ৮৫ শতাংশ আর বাদবাকী ১৫ শতাংশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানীদের, আর সামরিক বিভাগের চাকুরীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অংশ ছিল ৯০ শতাংশ বাদবাকী মাত্র ১০ শতাংশ ছিলো পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য। আর চরম এসব বৈষম্যাবস্থা চলমান ও বর্ধমান তখন যখন (আমাদের) পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা সমগ্র পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি।

[২] প্রকৃতপক্ষে বৈষম্যজনিত ক্ষতির অর্থমূল্য হবে আরো অনেক গুণ বেশি। কারণ এ হিসেবে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ এবং আংশিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি বিবেচিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের হিসেবের ক্ষেত্রে পাকিস্তানে বিদেশি ঋণ-অনুদানে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য হিস্যার হিসেব করা হয়নি; হিসেব করা হয়নি বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যের যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে জনসংখ্যা অনুপাতে হিস্যা; একইভাবে হিসেব করা হয়নি বাজেটে অন্যান্য উন্নয়ন খাত যেমন শিল্প, অবকাঠামো, কৃষিতে জনসংখ্যা অনুপাতে আমাদের ন্যায্য হিস্যা ইত্যাদি। এসব হিসেব করলে বর্তমান বাজার মূল্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তান ২৩ বছরে লুট করেছে কমপক্ষে ৫০ লক্ষ কোটি টাকা (১২ লক্ষ কোটি টাকা নয়)। এ প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে উল্লেখ করেছেন "পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের কষ্টার্জিত ৩ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুটে নিয়ে তাদের পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তোলার কাজে মত্ত ছিল"। আমার মতে বঙ্গবন্ধু উদ্ধৃত ঐ ৩ হাজার কোটি টাকা লুটের হিসেব প্রকৃত লুটের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কারণ উন্নয়ন খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের ৬ হাজার কোটি টাকার বিপরীতে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ মানুষ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল ৩ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ এ হিসেবে জনসংখ্যার অনুপাতের নিরিখে পাকিস্তানের মোট উন্নয়ন বরাদ্দে আমরা গড়ে বছরে ১,৭৭০ কোটি টাকা কম পেয়েছি। সে হিসেবে ২৩ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে আমরা মোট ৪৯,৭১০ কোটি টাকার সমপরিমাণ ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তারপরও যদি ধরেও নি যে বঙ্গবন্ধুর কথাটিই ঠিক অর্থাৎ ওরা ২৩ বছরে আমাদের কষ্টার্জিত ৩ হাজার কোটি টাকা লুট করেছে সেক্ষেত্রে আসল হিসেবটি কেমন হবে? ঐ ৩ হাজার কোটি টাকার বর্তমান বাজার মূল্য হবে কমপক্ষে ১২ লক্ষ কোটি টাকার সমপরিমাণ। এ হিসেবের ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়েছি সোনার দাম– যা ভরি প্রতি পাকিস্তান আমলে গড়ে ছিল ১৪০ টাকা আর বাংলাদেশ আমলে গড়ে ৫৫ হাজার টাকা (অর্থাৎ এখন ৩৯৩ গুণ বেশি)।

[৩] বঙ্গবন্ধু প্রণিত ঐতিহাসিক ৬ দফা নিয়ে এখনও অনেকেরই তেমন কোনো ধারণা নেই অথবা ভ্রান্ত ধারণা আছে বিধায় বিষয়টি স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন। অনেকেরই ধারণা এরকম যে '৬ দফা ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবিনামা'– এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। আসলে ৬ দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে ফেডারেল সরকারের **অঙ্গরাজ্য** হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিনামা। ঐতিহাসিক ৬ দফার মূল স্বাপ্নিক ও প্রণেতা বঙ্গবন্ধু নিজেই। ৬ দফা প্রণয়নে তিনি অনেকেরই পরামর্শ নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ করার জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের জাতীয় কনফারেন্সে যোগদান করেন। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ কাউন্সিল মুসলিম লীগের

হিসেবে দেখতে চেয়েছিলাম; **যেহেতু** ১৯৭০এ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করার পরেও আমাদেরকে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনাসহ সরকার গঠন করতে দেয়া হয়নি; **যেহেতু** রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক– সবদিক থেকেই সাংবিধানিক, ন্যায়-বিধানিক, নৈতিক সকল মাপকাঠিতে পাকিস্তান-রাষ্ট্র গঠনের শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে নয়া-ঔপনিবেশিক কলোনি হিসেবে দেখা হয়েছে; আর এ সবের পুঞ্জীভূত রূপ হিসেবে, **যেহেতু** শেষ পর্যন্ত আমরা ১৯৭১-এর সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে শোষণ-বৈষম্যহীন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র-ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলাম, এবং **যেহেতু** ঐ স্বপ্ন বাস্তবায়নে স্বাধীনতার ঘোষণা (Proclamation of Independence, এপ্রিল ১৯৭১) এবং ১৯৭২-এর সংবিধানের মূলনীতি-ভিত্তি হিসেবে জনগণের মালিকানাধীন একটি রাষ্ট্রকাঠামোতে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, ও সমাজতন্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে বৈষম্যহীন-শোষণমুক্ত একটি আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম যেখানে বলা হয়েছিল "*আমাদের রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে*" (সংবিধানের প্রস্তাবনা) ***সেহেতু*** ১৯৭১-এর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক, মহাকাব্যিক ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সহজবোধ্য-সুস্পষ্ট ভাষায় সংক্ষেপে ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা বর্ণনা-বিশ্লেষণপূর্বক সমগ্র জাতির প্রতি স্বাধীনতা যুদ্ধ– মুক্তিযুদ্ধে প্রস্তুতির আহবান জানিয়ে বললেন "...আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায় বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়। বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। ... নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা যেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করব এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। ...কিন্তু আজ দুঃখের সাথে বলতে হয়, ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের; বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।...এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। ...জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। ...(পরে) তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি (ভুট্টো সাহেব) বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে। ...তারপরে (এসেম্বলি) বন্ধ করে দেয়া হলো। দোষ দেয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেয়া হলো আমাকে। (এসেম্বলি) বন্ধ করে দেয়ার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। ...কি পেলাম আমরা? যে আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে

সাবজেক্ট কমিটির সভায় বঙ্গবন্ধু ৬ দফা পেশ করেন, কিন্তু ঐ সভায় তা গৃহীত হয়নি। ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৬) ঢাকায় ফিরে এসে বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ করেন। সংক্ষেপে দফাসমূহের সারবস্তু নিম্নরূপ: (দফা ১) ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ; সরকার হবে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির; সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট হবে সার্বভৌম; (দফা ২) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রে– দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি; অন্যান্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ; (দফা ৩) হয় সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে, আর সেটা না হলে একটি মুদ্রাই চালু থাকবে এবং সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ পাচার বন্ধ করতে হবে আর সেইসাথে পূর্ব পাকিস্তানে পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের ব্যবস্থা থাকতে হবে; (দফা ৪) ফেডারেশনের অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে– কেন্দ্রীয় সরকারের সে ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ রাষ্ট্রের রাজস্বের একাংশ কেন্দ্রীয় সরকার পাবেন এবং অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর মোট করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে; (দফা ৫) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যকে পৃথক হিসাব করতে হবে এবং ঐ অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর এখতিয়ারাধীন থাকবে; কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোন হারে অঙ্গরাষ্ট্র দেবে; অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না; অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে; এবং (দফা ৬) অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে (স্বাক্ষর করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ; লাহোর, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬)। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ৬ দফার বিষয়বস্তু নিয়ে দ্ব্যর্থতা-বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ নেই– ৬ দফা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের কোনো দাবিনামা ছিল না, তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে ফেডারেল সরকারের অঙ্গরাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিনামা। এখানে ঐতিহাসিক কারণেই উল্লেখ করা উচিত যে ১৯৩৯ সালে জনাব কায়েদে আজম জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে ঘোষণা করেন 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'। এর বিপরীতে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ জিন্নাহ সাহেবের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সপ্তবিংশতিতম অধিবেশনে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ভারতের ভবিষ্যত শাসনতান্ত্রিক রূপ সম্পর্কিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে উত্থাপন করেন। 'লাহোর প্রস্তাব' খ্যাত এ প্রস্তাবে পাকিস্তান শব্দেরই কোনো উল্লেখ ছিল না। লাহোর প্রস্তাবটি ছিল এক কথায় এরকম: ভারতের পূর্ব (বাংলা ও আসাম) এবং পশ্চিম (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব) অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত স্বাধীন ও সার্বভৌম দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন। এ প্রসঙ্গটি ঐতিহাসিক জরুরি আর আমার মতে, পূর্ব বাংলার জনগণ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ২ বছর পর অর্থাৎ ১৯৪৯ সাল থেকেই স্বায়ত্তশাসন দাবি করে আসছে। আর পাকিস্তান সৃষ্টির ১৮ বছর পরে (১৯৬৬ সালে) বঙ্গবন্ধু যে ৬ দফা দাবি প্রণয়ন করলেন এবং তারই ভিত্তিতে যে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু হলো তা থেকে ২টি বিষয় স্পষ্ট: (১) পাকিস্তানের স্বৈরাচারি সামন্ত-সেনাশাসকেরা ঠিকই বুঝেছিলো যে ৬ দফা নেহায়েতই পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের অঙ্গরাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেবার জন্য রচিত হয়নি, তা রচিত হয়েছিলো এ উদ্দেশ্যে যে পাকিস্তান কাঠামোতে পূর্ব পাকিস্তান আর থাকতে সম্পূর্ণ নারাজ, (২) আর ৬ দফা আসলেই প্রণীত হয়েছিলো পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ববাংলা হিসেবে নয়, স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে গঠনের রাজনৈতিক ভিত্তি-দর্শন হিসেবে।

রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী-আর্ত মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ... টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার (পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের) কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম... দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। ...কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন আমি না-কি স্বীকার করেছি যে, ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। কিসের আরটিসি? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব? ...পঁচিশ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ...আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ঐ শহীদের রক্তের উপর দিয়ে, পাড়া দিয়ে আরটিসি-তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেম্বলি কল করেছেন আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। ...আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। ...এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। ...আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। ...গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য... রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দফতরগুলো– ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। ...এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলিঃ আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এ দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হলো। কেউ দেবে না। ...রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমার নিউজ না দেয় কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে– যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে। কিন্তু, পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। ...প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব– এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। **এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম**[৪]। **জয় বাংলা**[৫]। অর্থাৎ এক কথায় মর্মার্থ হল বঙ্গবন্ধুর ভাষণে আমরা স্পষ্টভাবেই চেয়েছিলাম আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ স্বাধীনতা (freedom) ও মুক্তি (liberty); যেখানে মানুষের মৌলিক জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তি-ভিত্তিক উন্নয়ন হবে স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী (freedom-mediated) একটি প্রক্রিয়া যা এদেশে বৈষম্য হ্রাসসহ প্রতিটি "নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার" (সংবিধান, ১৯ অনুচ্ছেদ) লক্ষ্যে প্রতিটি মানুষের জন্য পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে, যেগুলি হ'লঃ (১) রাজনৈতিক স্বাধীনতা, (২) অর্থনৈতিক সুযোগ, (৩) সামাজিক সুবিধাদি, (৪) স্বচ্ছতার গ্যারান্টি, এবং (৫) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা।

২. দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু কি চেয়েছিলেন? কি ছিলো তার দর্শন? আর হলোটা কি?

সেকস্‌পিয়ার বলেছিলেন এ জগৎ সংসারে "কেউ কেউ জন্মগতভাবেই মহান, কেউ কেউ স্বীয় প্রচেষ্টায় মহানুভবতা অর্জন করেন, আবার কেউ কেউ মহত্বের লক্ষণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন"। আমার মতে সেকস্‌পিয়ার উদ্ধৃত মহত্বের ৩টি বৈশিষ্ট্যই

[৪] ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে শেষের বাক্যে বঙ্গবন্ধু যখন বললেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" ঠিক সে সময়েই পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা তাদের রিপোর্টে লিখলো "সুচতুর শেখ মুজিব সুকৌশলে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দিলো– চুপ করে দেখা ছাড়া আমাদের কিছুই আর করার ছিল না।"

[৫] ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের মহাকাব্যিক ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আর সেইসাথে এ লেখার সাথে সাযুজ্য রক্ষার যুক্তিযুক্ত কারণে ভাষণের বেশ বড় অংশ উদ্ধৃত করা হলো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য। আর কিউবার প্রেসিডেন্ট বিপ্লবী ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন "আমি হিমালয় দেখিনি, আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি"। বৃটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট (১৯৭২ সালে এক সাক্ষাৎকারে) বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "আপনার শক্তি কোথায়"? বঙ্গবন্ধুর উত্তরঃ "আমি আমার জনগণকে ভালবাসি"। আর যখন জিজ্ঞেস করলেন "আপনার দুর্বল দিকটা কি"? বঙ্গবন্ধুর উত্তর "আমি আমার জনগণকে খুব বেশি ভালবাসি"। এইই হল বঙ্গবন্ধু। জনগণের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর অপার আস্থা-বিশ্বাস, মানুষের প্রতি নিঃশর্ত-ভালবাসা, মমত্ববোধ, সহমর্মিতার বিরল দৃষ্টান্ত সমৃদ্ধ মানুষ– বঙ্গবন্ধু।

জনগণের অন্তর্নিহিত অপার শক্তি ও অসীম ক্ষমতার উপর বিশ্বাস; জনগণ এবং কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে– এইই ছিলো বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-দর্শনের মূলভিত্তি (যা ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে স্পষ্ট)। জনগণের স্বার্থ বিশেষত দরিদ্র মেহনতি মানুষের স্বার্থ ছিলো তার কাছে সব কিছুর উর্ধ্বে। আর সে কারণেই দেশপ্রেমের যত রূপ আছে; মানুষের প্রতি ভালবাসার যত রূপ আছে, যত মমত্ববোধ আছে; মানুষের প্রতি সহমর্মিতার যত রূপ আছে; মানুষের প্রতি আস্থার যত ধরন আছে; মহানুভবতার যত রূপ আছে; ন্যায় প্রতিষ্ঠার যত সংগ্রামী রূপ আছে– এত বহুমুখী বিরল বৈশিষ্ট্য যে একক ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিলো– তিনিই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এসবই বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন ও রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি। এসবই বঙ্গবন্ধুকে করেছে "দেশজ উন্নয়ন দর্শনের" (home grown development philosophy) উদ্ভাবক, স্রষ্টা, বিনির্মাতা।

সামন্ত-সেনা শাসিত আধা ঔপনিবেশিক-সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান কাঠামোতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটেনি। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি এ দেশের মানুষের সুদীর্ঘ লড়াই, সংগ্রাম, আন্দোলন ও ত্যাগ তিতিক্ষার ফল। তা এ দেশের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ-বয়স-পেশা-ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার ফসল। আর মুক্ত ও স্বাধীন হবার বাঙালির এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাটি যে ব্যক্তি, যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব জনগণের অধিকার রক্ষার স্বার্থে তার সারা জীবনে কখনও কোনো ধরনের আপোষ ব্যতীতই বাস্তবে রূপান্তরের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনিই বঙ্গবন্ধু– জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। এক কথায় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত, ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রমহানিসহ (এ সংখ্যাটি আমার হিসেবে কমপক্ষে ১০ লক্ষ[৬]) ব্যাপক মানবিক ও ভৌত অবকাঠামোর ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে আমরা অর্জন করলাম স্বাধীনতা (এ বিষয়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। বঙ্গবন্ধু হাজারো ষড়যন্ত্রের মধ্যে জাতিকে উপহার দিলেন স্বাধীনতা। "হাজারো ষড়যন্ত্র" কথাটি বলার আমার সুনির্দিষ্ট কারণ আছে যা হয়তোবা তরুণ প্রজন্মসহ এদেশের অধিকাংশ মানুষের অজানা। ষড়যন্ত্রের বিষয়টি এরকমঃ ২১ মার্চ ১৯৭১ সকাল– মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর প্রাক্তন কর্মকর্তা তৎকালীন পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্টদূত জোসেফ ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রাক-ধারণা ছিলো এরকম– "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বুঝেছে যে বাঙালিরা পিছু হটবে না। ওরা বুঝেছে এ দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণকে কোনো পথেই কোনো পদ্ধতিতেই আর ঠেকানো সম্ভব নয়। তাই মার্কিন সরকারের রাষ্ট্রদূত মারফত প্রেরিত প্রস্তাব অনুরূপই হবে"। তাই হলো। জোসেফ ফারল্যান্ড আসলেন এবং তিনি বঙ্গবন্ধুকে মার্কিন সরকারের প্রস্তাবটি বললেন। তিনি বললেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে সবধরনের সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত, এমনকি তারা বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতার ব্যবস্থা করে দেবেন। তবে এক শর্তে, শর্তটি এরূপঃ চট্টগ্রাম থেকে ১৫০ মাইল দক্ষিণে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার মধ্যে বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত সেন্ট মার্টিন দ্বীপটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দীর্ঘমেয়াদে ইজারা দিতে হবে। প্রস্তাবটি বঙ্গবন্ধু শোনামাত্র শুধু প্রত্যাখ্যানই করেননি জোসেফ ফারল্যান্ডকে মুখের উপর বলেছিলেন "মিস্টার ফারল্যান্ড আমি আপনাকে চিনি। ইন্দোনেশিয়া ও আর্জেন্টিনায় আপনি সামরিক অভ্যুত্থানের পিছনে ছিলেন তাও আমি জানি। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি আমার দেশকে পাকিস্তানি শেয়ালদের হাত থেকে মুক্ত করে আমেরিকার বাঘদের হাতে তুলে দিতে পারি না। আপনাদের এ ধরনের শর্ত আমার কাছে কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না। হতেও পারে না"।[৭]

[৬] আমার এ হিসেবের পদ্ধতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তৃতীয় অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

[৭] বিস্তারিত দেখুনঃ মোতাহার হোসেন সুফী, ২০০৯, ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক, অনন্যা প্রকাশনা (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃঃ ২৭৬-২৭৭।

স্বাধীনতা তো দিলেন কিন্তু আসলে কি চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু? কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন? গড়তে চেয়েছিলেন কোন বাংলাদেশ? আমার মতে বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন তারই উদ্ভাবিত দেশের মাটি থেকে উত্থিত অথবা স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শনের (home grown development philosophy) ভিত্তিতে এমন এক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে যে বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা; যে বাংলাদেশে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি হবে চিরস্থায়ী; যে বাংলাদেশ হবে চিরতরে ক্ষুধামুক্ত-শোষণমুক্ত, যে বাংলাদেশে মানব মুক্তি (liberty) নিশ্চিত হবে; যে বাংলাদেশে নিশ্চিত হবে মানুষের সুযোগের সমতা; যে বাংলাদেশ হবে বঞ্চনামুক্ত-শোষণহীন-বৈষম্যহীন-সমতাভিত্তিক-অসাম্প্রদায়িক দেশ; যে বাংলাদেশ হবে সুস্থ-সবল-জ্ঞান-চেতনাসমৃদ্ধ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মানুষের দেশ। কেমন বাংলাদেশ চাই প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বেতার ও টিভি ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেন "আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাস করে। এটা কোনো অগণতান্ত্রিক কথা মাত্র নয়। আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি নতুন ব্যবস্থার ভীত রচনার জন্য পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়বো "।

নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে বঙ্গবন্ধু প্রথমেই যে কাজটি করলেন তা হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন। এ ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধু তার গভীর দেশপ্রেম, বিরল প্রতিভা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র গঠনে দুরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২এ আর সংবিধান রচিত হয়ে গেলো ৪ নভেম্বর ১৯৭২এ– অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাত্র ১০ মাসের মধ্যেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন হয়ে গেলো। ইতিহাসে এও এক বিরল দৃষ্টান্ত যে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে এত কম সময়ের মধ্যেই সংবিধান প্রণয়ন হয়ে গেলো। তাও আবার যেনতেন সংবিধান নয়। জনগণের শক্তির প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপার আস্থা-বিশ্বাসনির্ভর দেশজ উন্নয়ন দর্শনভিত্তিক সংবিধান। শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা নিরসনসহ অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিকাশ উদ্দিষ্ট চার স্তম্ভভিত্তিক বিরল এক সংবিধান। স্তম্ভ চারটি হলো: গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা (অথবা অসাম্প্রদায়িকতা), এবং সমাজতন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এ সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করলেই সহজেই বোঝা যাবে যে আসলে কেমন বাংলাদেশ তিনি গড়তে চেয়েছিলেন। সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের কয়েকটি নিম্নরূপ যা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের মর্মবস্তুর সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ যেখানে তিনি বলেছিলেন 'আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই, মুক্তি চাই, স্বাধীনতা চাই; উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন 'গরীব দুঃখী-আর্ত মানুষের ন্যায্য' হিস্যার কথা:

১. প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ (*সংবিধান ,অনুচ্ছেদ ৭*)
২. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা (*অনুচ্ছেদ ১৫.ক*)
৩. কর্মের অধিকার; যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কাজের নিশ্চয়তার অধিকার (*অনুচ্ছেদ ১৫.খ*)
৪. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার (*অনুচ্ছেদ ১৫.খ*)
৫. সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা;... মানুষে-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ (*অনুচ্ছেদ ১৯/১,২*)
৬. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; ...আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর (*অনুচ্ছেদ ১৭ ক,খ*)
৭. মেহনতি মানুষকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি (*অনুচ্ছেদ ১৪*)
৮. জীবনমানের বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে কৃষি বিপ্লব (*অনুচ্ছেদ ১৬*)
৯. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ (*অনুচ্ছেদ ১০*)
১০. মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ (*অনুচ্ছেদ ১১*)
১১. ...জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না (*অনুচ্ছেদ ৩২*)

১২. ... কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না (*অনুচ্ছেদ ২৮.১*)

১৩. আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান (*অনুচ্ছেদ ২৭*) ।

মোদ্দা কথা হলো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন দেশ, যেখানে জনগণ এবং একমাত্র জনগণই সার্বভৌম। মুক্তি সংগ্রামে অর্জিত এই দেশের মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু কমপক্ষে দু'টি বিষয় নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আজ থেকে ৪৩ বছর আগে মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিলো: প্রথমত, বৈষম্যহীন এক অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র গঠন; আর দ্বিতীয়ত, অসাম্প্রদায়িক (secular) মানস কাঠামো বিনির্মাণ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐ আকাঙ্ক্ষার কাজটি ঠিক-ঠাকই শুরু হয়েছিলো। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী তিন-চার বছরে দেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষামুখী ছিলো।

কিন্তু কি এমন হলো যে উল্লিখিত জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হলো না। এর মূল কারণ কি? আমার মতে কারণটি এরকম: বঙ্গবন্ধু যে দিন থেকে (১৯৭২ সালের ২৬ মার্চে প্রথম স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে) সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক-জাতীয়তাবাদী-ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের কথা বলছেন, বলছেন নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন অর্থনৈতিক ও সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে ঠিক তখন থেকেই ইতোপূর্বে সংগঠিত-সংঘবদ্ধ দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারী প্রতিবিপ্লবীরা আরো দ্রুতলয়ে আরো বেশি শক্তি নিয়ে ষড়যন্ত্র-কর্মকাণ্ড জোরদার করলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের দালাল মোশতাক– তাহের উদ্দিন ঠাকুর- মাহবুবুল আলম চাষী চক্রের ষড়যন্ত্র;[৮] জিয়াউর রহমানসহ কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল সেনা সদস্যের সরকার পতনের ষড়যন্ত্র; ঔপনিবেশিক মানসিকতার আমলাতন্ত্র[৯]; দুর্নীতি[১০], সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে থাকা রাজাকার-আলবদর-আল শামসসহ জামায়াতে ইসলামের ষড়যন্ত্র; মূল্যস্ফীতি ডবল ডিজিটে পৌঁছে দেয়ার সফল ষড়যন্ত্র; খাদ্য গুদাম লুট, মজুতকারীসহ[১১] খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা অকেজো করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের পিএল ৪৮০-র আওতায় সবচে মারাত্মক মারণাস্ত্র "খাদ্যের রাজনীতি" প্রয়োগ[১২] (উপলক্ষ হিসেবে শর্ত দিয়েছিলো আমরা

---

[৮] মোশতাক-ঠাকুর-চাষীসহ সমজাতীয় ষড়যন্ত্রকারীরা হয় ইতিহাস জ্ঞানে কাঁচা ছিলেন অথবা জ্ঞানপাপি ছিলেন অথবা জাস্ট বেঈমান চরিত্রের অমানুষ ছিলেন অথবা একই সাথে সবগুলো। এখানে বাংলার ইতিহাসের কিয়দংশ স্মরণ করা সমীচীন হবে। ১৭৫৭ সাল– ভারতবর্ষের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে উপনিবেশবাদী ইংরেজরা (১৭৫৭ সালের ২৯ জুন) মীর জাফরকে বাংলার নবাব পদে বসালেন। প্রকৃত ক্ষমতা কিন্তু ইংরেজদের হাতেই রয়ে গেল। মীর জাফরের অযোগ্যতা-অদক্ষতার কারণে তারই জামাতা মীর কাসিম হলেন বাংলার নবাব। তবে মীর কাসিম ছিলেন স্বাধীনচেতা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিনা শুল্কে ব্যবসার অধিকার দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কর্মচারীরা যখন ব্যক্তিগতভাবে বিনা শুল্কে ব্যবসার অধিকার দাবি করে বসলো তখন মীর কাসিম আপত্তি জানালেন। এ নিয়ে নবাবের সাথে বিরোধ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরিণত হলো। মীর কাসিমের দুই ঘনিষ্ঠ– নবাব সুজাউদ্দৌলাহ ও সম্রাট দ্বিতীয় শাহআলম ইংরেজদের সাথে হাত মিলালো। আর মীর কাসিম পলাতক অবস্থায় ১৭৭৭ সালে অজ্ঞাত অবস্থায় মারা গেলেন।

[৯] ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশন ভাষণে ঔপনিবেশিক মানসিকতার আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন নিয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন "উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীন জাতির জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী একটি প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামো। এর কিছু আমলা ঔপনিবেশিক মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। তারা এখনও বনেদি আমলাতান্ত্রিক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে চলছে। আমরা তাদেরকে স্বাধীন জাতীয় সরকারের অর্থ অনুধাবনের উপদেশ দিচ্ছি। এবং আশা করছি, তাদের পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে। আমার সরকার নব-রাষ্ট্র এবং নতুন সমাজের উপযোগী করে প্রশাসনযন্ত্রকে পুনর্গঠিত করবে। প্রস্তাবিত প্রশাসনিক কাঠামোতে জনগণ ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টির পূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।" বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তীকালে দেশ উল্টোপথে পরিচালিত হয়েছে। ফলে আমার মতে অবস্থাটা এখন এরকম– দেশ চালায় rent seeker-রা আর শাসন-প্রশাসন যন্ত্রের আমলারা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঐ rent seeker-দেরই অধীনস্থ সত্তা; রাষ্ট্রযন্ত্রের সবকিছুই এখন rent seeker-দের কথায় ওঠাবসা করে। আর এসবের ফলে জনগণের সাথে সরকারের নৈকট্য নয় দূরত্ব বেড়েছে এবং তা ক্রমবর্ধমান।

[১০] পাকিস্তান কারাগার থেকে ফিরে এসে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন "...বাংলার মাটি থেকে করাপশন উৎখাত করতে হবে। করাপশন আমার বাংলার কৃষকরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ"।

[১১] ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশন ভাষণে মজুতদারদের হুঁশিয়ার করে বঙ্গবন্ধু বললেন "বিপুল খাদ্য ঘাটতি আমাদের জন্য এক দুঃসহ অভিশাপ।... সামনের কয়েক সপ্তাহ আমাদের জন্য ঘোর দুর্দিন। ... এ প্রসঙ্গে আমি মজুতদার, চোরাকারবারী ও গুজববিলাসীদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি , তারা যেন নিরন্ন মানুষের মুখের রুটি নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে– তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে।" অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খাদ্য মজুত ও চোরাকারবার নিয়ে ষড়যন্ত্রটা শুরু থেকেই করা হয়েছে। এ ষড়যন্ত্র স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃহৎ ষড়যন্ত্রের অংশ মাত্র।

[১২] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল তাতে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনই সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে আমি সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত। সাম্রাজ্যবাদের হোতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পৃথিবীর সকল দেশেই রাজনৈতিক পরিবেশসহ রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে রীতিমতো নির্মোহ গবেষণা করে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ-নীতি-দর্শন তারা দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা-পর্যবেক্ষণ করে কয়েকটি বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত হয়েছিলো। যার অন্যতম (১) বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার কথা বলেন, (২) বঙ্গবন্ধু জাতীয় মুক্তি আন্দোলন (National Liberation Movement)-এর সমর্থক, যেখানে সমাজতন্ত্রের তত্ত্বানুযায়ী উন্নয়নশীল দেশসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সমাজতন্ত্রের পক্ষের প্রাথমিক ধাপ, (৩) বঙ্গবন্ধু ১৯৭১-এর ২১ মার্চ পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের প্রস্তাব "বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সেন্ট মার্টিন দ্বীপ যুক্তরাষ্ট্রকে দীর্ঘমেয়াদে ইজারা দিলে মার্কিন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দেবে"–টি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন, (৪) বঙ্গবন্ধু কঠিন শর্তের বৈদেশিক ঋণ-অনুদান নেবার বিপক্ষে ছিলেন; তিনি পরনির্ভরশীলতা পছন্দ করতেন না; স্বনির্ভর-স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি-রাষ্ট্র গঠনে বিশ্বাসী, (৫) বাংলাদেশে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হলে দুই মেরুর বিশ্বে সমাজতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পাবে, (৬) বঙ্গবন্ধু ১৯৭২-এর সংবিধানে 'সমাজতন্ত্রকে' সংবিধানের চার মূল স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, (৭) ভূ-রাজনৈতিকভাবে এবং অস্ত্র ব্যবসায় পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র ছিল পরস্পরের বন্ধু, (৮) বৈশ্বিক রাজনৈতিক সমীকরণে ছিল একদিকে যুক্তরাষ্ট্র-চীন আর অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন-ভারত, যেখানে সোভিয়েত-ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু শক্তি। এসব কারণে আমি সন্দেহাতীতভাবে মনে করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার শুধুমাত্র ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাই করেনি তারা বঙ্গবন্ধুর হত্যার সাথে প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত। আর এসব কারণে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি (bottomless basket)সহ আরো অনেক ধরনের অন্যায় উক্তি, ব্যঙ্গ-কটুক্তি করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ যে বঙ্গবন্ধু হত্যাসহ মোশতাক-ফারুক-রশিদ-জিয়াউর রহমানের পুনর্বাসন করেছিল তা এখন দালিলিকভাবেই প্রমাণিত। সিআইএসহ মার্কিন সরকারের দলিলপত্রেই উল্লেখ আছে: (জাতির জনক বঙ্গবন্ধু) শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের প্রতি হেনরি

সমাজতান্ত্রিক কিউবায় পাট বেচতে পারবো না)– এসবই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মূল পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশে চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো। এমনই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবার পরিজনসহ হত্যা করা যায়। প্রতিবিপ্লবী এ শক্তি ষড়যন্ত্রের কাজটি দক্ষতার সাথেই করে ফেললো– ১৯৭৫-এর ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে।[১৩] একই এই খুনি চক্র কারাগারে আটক চার জাতীয় নেতাকেও (সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলি ও মো. কামরুজ্জামান) হত্যা করলো।

১৯৭৫ সালে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঐ দুই আকঙ্ক্ষার **সোনার বাংলাদেশ** গঠনের স্বপ্নকেই হত্যা করলো। বঙ্গবন্ধু হত্যার মাধ্যমে শুধু যে আমাদের সোনার বাংলা গড়তে দেয়া হয়নি তা-ই নয়, সেই সাথে সব ধরনের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র হয়েছে যে কিভাবে স্বাধীন বাংলাদেশকে পশ্চাৎমুখী করে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে (failed state) এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বশংবদ রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়। আর সে কারণেই পরবর্তীকালের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় লাগাতার সেনা শাসন, স্বৈরতন্ত্র, সেনা শাসনের মোড়কে গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি তোষণ ও পোষণ, মৌলবাদের অর্থনীতির ও রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত– এ সবের ফলে সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্রের ধারা; দেশি-বিদেশি দুর্বৃত্তদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে সামরিক ছাউনিতে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; সামরিক ফরমানের মাধ্যমে জনগণের স্বার্থবিরুদ্ধ বিষয়াদি ১৯৭২-এর মূল সংবিধান থেকে কর্তন-পরিবর্তন করা হয়েছে; স্বাধীনতা বিরোধী নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করা হয়েছে; যুদ্ধাপরাধীসহ সকল সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করা হয়েছে; শুধু পুনর্বাসনই নয় স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ বিরোধী রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের রাষ্ট্রক্ষমতার-সরকারের অংশীদার করা হয়েছে; সন্ত্রাস, কালোটাকা ও পেশিশক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে "নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা উপড়ে ফেলার" যে কথাটি বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন সেটাকেই অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হয়েছে। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যে বা যারাই থাকেন না কেনো চালকের আসনে কোনো না কোনোভাবে শক্তভাবে বসে পড়েছেন তারা যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করেন না– যারা অন্যের সম্পদ হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে অনুপার্জিত আয়কারী লুটেরা শ্রেণি (যাদের বলা হয় Rent Seeker)[১৪] হিসেবে সরকার ও রাজনীতিব্যবস্থাকে তাদের অধীনস্থ-কব্জাগত করে

কিসিঞ্জারের ব্যক্তিগত বিরাগ ছিল; কিসিঞ্জার বলেছেন 'মুজিব ছিলেন বিশ্বসেরা বোকাদের একজন'; সিআইএর ১৯৭২ সালের ২১ ডিসেম্বর নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে 'সরকার পরিবর্তন হবে এক আকস্মিক আঘাতে'; 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিক্সন-কিসিঞ্জার ঐতিহাসিক পক্ষপাত দুষ্ট'; ফারুক-রশিদ তৎকালিন ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটির পক্ষে ১৯৭২ সালে ঢাকায় মার্কিন দুতাবাসে গিয়েছিল'; 'জিয়া পঁচাত্তরের অক্টোবরের আগে বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী সম্ভাব্য ভারতীয় হস্তক্ষেপ ঠেকাতে মার্কিন সাহায্য চান– তখন তিনি নেপথ্যের নায়ক'; ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার– খন্দকার মোশতাক ও জিয়া সরকার যেন টিকে থাকে সে জন্য তৎপর ছিল; বোস্টার সাহেব বলেছিলেন '১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট এর ঘটনা যারা ঘটিয়েছেন তারা দায়িত্বহীন নন'; ১৯৭৫এর ২০ আগস্ট প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ-এর সাথে প্রথম বৈঠকেই মোশতাক বোস্টারের হাত চেপে ধরে বলেছিলেন 'যে সুযোগ একাত্তরেই হারিয়েছি, তা এবার আর হাতছাড়া করা যাবে না'; বঙ্গবন্ধুর খুনিদের প্রতি কিসিঞ্জার যথেষ্ট সহানুভূতি দেখান যে কারণে 'ফারুক রহমানরা ব্যাংককে গিয়েও মার্কিন কুটনীতিকদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বৈঠক করেন'; কিসিঞ্জার বলেছিলেন 'মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পেরে ধন্য মনে করছি' (বিস্তারিত দেখুন, মিজানুর রহমান খান, ২০১৪, মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড, পৃ: ১০, ৫২, ৬১-৬৬, ৭৩, ১০৮, ১৯০, প্রথমা প্রকাশনা, ঢাকা)।

[১৩] এখানে উল্লেখ জরুরি যে, বঙ্গবন্ধু তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা ভারতীয় মেজর জেনারেল (অব.) এসএস উবান তার "Phantoms of Chittagong:. The "Fifth Army" in Bangladesh" গ্রন্থে লিখেছেন: "লক্ষ করলাম তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) বাসার কোথাও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। ...তাঁর সাথে দেখা করতে আসা মানুষজনের কোনো বাছ-বিচার নেই– একথা তুলতেই তিনি বললেন– 'আমি জাতির জনক। দিন-রাতের যেকোনো সময়ে আমার কাছে প্রত্যেকের আসার অধিকার আছে। কেউ যদি কষ্ট-বেদনায় থাকে, তার সামনে তো আমি আমার দরজা বন্ধ করে দিতে পারি না"। এর পর জেনারেল (অব.) উবান লিখছেন "আমি তাকে বললাম, আমি আপনার এ অনুভূতিতে মুগ্ধ, তবে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি জাতির প্রতি দায়বদ্ধ। ...আমার মনে হয়, জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক নেতারা ঝুঁকি নিয়ে থাকেন, কিন্তু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়ে মুজিব যতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন ততদূর খুব কম সংখ্যকই গিয়েছেন" (মূল গ্রন্থের অনুবাদক হোসাইন রিদওয়ান আলী খান, ঘাস-ফুল-নদী প্রকাশনা, ২০১৪, ঢাকা: পৃ: ১৪২।

[১৪] Rent seeker ও Rent seeking বিষয়টির সংক্ষেপ ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। বিষয়টি এরকম– বিত্তবান বা সম্পদশালী হওয়া যায় দু'ভাবে বা দু'পদ্ধতিতে। প্রথম পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় সম্পদ সৃষ্টির (by creating wealth) মাধ্যমে– এটা rent seeking নয়; এ পদ্ধতিতে সমাজের মোট বিত্ত-সম্পদ বাড়ে (total wealth increases)। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, লুটতরাজ, আত্মসাৎসহ সমরূপী বিভিন্ন অনৈতিক পদ্ধতিতে। দ্বিতীয় পদ্ধতির এসবই rent seeking, আর এসবের সাথে যুক্ত যারা তারাই rent seeker। প্রথম পদ্ধতি যেখানে সমাজের মোট বিত্ত (wealth) বাড়ায় সেখানে rent seeking এর পরিণাম হয় ঠিক উল্টো। Rent seeking সমাজের মোট বিত্ত কমায় এমনকি ধ্বংস করে (total wealth decreases or destroys total wealth)। Rent seeking পদ্ধতির সরব উপস্থিতির অর্থ হলো সমাজের উঁচুতলার বিত্তবানদের বিত্তের বড় অংশ আর নীচুতলার মানুষের দুর্দশার উৎস– বিত্তের সৃষ্টি নয় (not creation of wealth) বিত্তের হস্তান্তর (wealth transfer অর্থে)। এ পদ্ধতিতে আবিষ্কারটা হলো এরকম: উপরতলার ধনীরা জনগণের সম্পদসহ নীচতলার মানুষের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ হাতড়ে নেবে কিন্তু নীচতলার মানুষ বুঝতেই পারবে না– কিভাবে কি হয়ে গেলো! আর rent seeking-এর এই প্রক্রিয়ায় rent seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের এক অশুভ সমস্বার্থের সম্মিলন ঘটে যা দুর্ভেদ্য– যে ত্রিভূজটি দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। এ ত্রিভূজ যতদিন বহাল থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে (Rent seeker ও Rent seeking বিষয়ের রাজনৈতিক অর্থনীতির জন্য বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১৪, "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে," পৃ: ৩-৪, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত লোকবক্তৃতা ২০১৪, ঢাকা: ২২ মার্চ ২০১৪)।

ফেলেছেন। এটাই ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী আমাদের ইতিহাসের মূল কথা। এ মূল কথা ভুলে গেলে ইতিহাস বিকৃতি হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সামনে এগুনো অসম্ভব হবে।

বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত আমাদের সংবিধান বলছে "জনগণই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক"। সংবিধানে মানুষে-মানুষে বৈষম্যের বিপরীতে সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকেই সাংবিধানিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল ও পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি– বাতিল ঘোষিত হয়েছে, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থেকে বিচ্যুতি নিয়মে রূপান্তরিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরবর্তীকালে বিচ্যুতির ফল হয়েছে এরকম যে, দেশ চলেছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিক উল্টোপথে। স্বপ্ন ছিলো সমতাভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা গঠনের কিন্তু তার জায়গায় প্রতিস্থাপিত করা হলো মুক্তবাজার অর্থনীতি যা কোনো অর্থেই বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বরং সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর জনকল্যাণ বিরোধী ব্যবস্থা। মুক্তবাজারব্যবস্থা ভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বাংলাদেশে আর্থসামাজিক বৈষম্যকে প্রকটতর করেছে ও করছেঃ বেড়েছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, গ্রাম-শহরের বৈষম্য, দুর্বল-সবলের বৈষম্য এবং নারী-পুরুষের বৈষম্য। পাশাপাশি বেড়েছে সুপার-ডুপার ধনী, জনগণের জীবন পরিচালনে প্রয়োজনীয় পণ্যের (ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) মূল্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অভাব, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা– পরস্পর সম্পর্কিত এসবই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনকে দুর্বিষহ করেছে ও তা অব্যাহত আছে। আইন শৃংখলা সুস্থিত নয়। আইন-বিচার-সরকার-রাজনীতি বাস্তবত ক্ষমতাবানদের পক্ষে কাজ করেছে ও করছে। দুঃশাসনের মাত্রাতিরিক্ততা সুশাসনকে কাগুজে বুলিতে রূপান্তরিত করেছে। সংবিধানে বিধৃত সকলের জন্য সমসুযোগের সমাজ সৃষ্টির দিকে না গিয়ে আমরা চলেছি উল্টো পথে। আর এসবের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তীকালে আমরা 'উন্নয়নের' কথা আওড়িয়ে চলেছি। আওড়িয়ে চলেছি সে উন্নয়নের কথা যা বঙ্গবন্ধুর "স্বদেশজাত-বৈষম্যহীন-শোষণমুক্ত-অসাম্প্রদায়িক" উন্নয়ন দর্শনের সাথে সাযুজ্যহীন ও বিপরীতমূখী।

৩। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি ও সমাজে ক্ষয়-ক্ষতির ধরন অনুযায়ী পরিমাণ, মাত্রা ও প্রভাব-অভিঘাতঃ একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

ধরুন মুক্তিযুদ্ধের আগে ১৯৭০ সালের কথা– একজন দরিদ্র-নিম্নবিত্ত কৃষকের ১ বিঘা চাষের জমি আছে, হালের দুটি গরু আছে, চাষের জন্য লাঙ্গল-মই-নিরানি আছে, আছে আগামী ফসলের জন্য সংরক্ষিত বীজ আর সেই সাথে আছে জরাজীর্ণ বসতভিটা, কিন্তু ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে শুধু চাষের জমি ছাড়া সবকিছু হারিয়ে তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন[১৫]। জীবনে বংশ পরম্পরা সৃষ্ট সম্পদ-সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে গেলো। আর সেইসাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে তার একজন তরতাজা যুব-সন্তান শহিদ হলো অথবা চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেলো। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে ঐ কৃষকটি কি জীবনে আর কোনদিন, আর কখনও পরিবার পরিজনসহ উঠে দাঁড়াতে পারবেন; এমনকি দরিদ্র হলেও পারবেন কি আগের মত ঠিক একই রকমের দরিদ্র অবস্থাতেও ফিরতে? গ্রাম-শহর নির্বিশেষে, বিশেষত গ্রামে, ঠিক এরকমটিই ছিলো মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অবস্থা। হিমালয় পর্বতে আরোহণ করা যায়, সমুদ্রের তলদেশেও পৌঁছানো যায়, রকেটে করে চাঁদসহ বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে যাওয়া সম্ভব কিন্তু সর্বস্বান্ত ঐ কৃষককের মাজা সোজা করে উঠে দাঁড় করানোর পথ-পদ্ধতি আছে কি? অন্তত প্রচলিত উন্নয়ন-অর্থনীতি শাস্ত্রে নেই। আর এ প্রায়-অসম্ভব, অতীত অভিজ্ঞতাহীন, দুরূহ এ প্রয়োগিক বাস্তব দায়িত্বটিই নিতে হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্বাসন, পুনর্গঠন, পুনঃনির্মাণ-নির্মাণ কর্মকাণ্ড যে কি মাত্রায় জটিল ছিল এ বিষয়ে অনুল্লিখিত ও স্বল্পগবেষিত কয়েকটা বিষয় বলা জরুরি। বিষয়সমূহ এ রকম। একদিকে জনসংখ্যা বেশি হবার পরেও পাকিস্তানের স্বৈর-সেনা-সামন্ত-আধাঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে ২৩ বছরের শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় কম (যা আগেই উল্লেখ করেছি) আর অন্যদিকে ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে বিধ্বস্ত সকল ধরনের অর্থনৈতিক অবকাঠামো (রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভাট, বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য) এবং পারিবারিক

[১৫] এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেল টিক্কা খান স্পষ্টভাষায় তাদের হীন উদ্দেশ্যের কথা বলে দিয়ে ছিলেনঃ "মৃত্তি মাংতা আদমি নেহি" অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে শুধু মাটি টুকুই থাকবে– পোড়া মাটি, কোনো মানুষ থাকবে না। টিক্কা খান নাকি মুসলমান? অথচ ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্মই বলে মানুষ হলো "আশরাফুল মাখলুকাত"– সৃষ্টির সেরা জীব; তুমি যা সৃষ্টি করতে পার না তা ধ্বংস করা পাপ; জীবে সেবা করিছে যে জন সে জন সেবিছে ঈশ্বর; জীব হত্যা মহাপাপ, ইত্যাদি। আর ইয়াহিয়া খান তো ছিলো তার ওস্তাদ। আরো এক কাঠি উপরে। তিনি বলেই বসলেন, পূর্ব পাকিস্তানে "আদমি নেহি মাংতা, মৃত্তি ভি নেহি" অর্থাৎ পোড়া মাটি তো নয়ই, কোনো মানুষই থাকতে পারবে না।

অবকাঠামো ধ্বংসপ্রাপ্তিসহ (প্রায় ৩ কোটি মানুষ সর্বস্বান্ত হন[১৬]) ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হবার ফলে কৃষি-শিল্পে মেহনতি মানুষের সংখ্যা হ্রাস পায় যার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান আমলের বৈষম্যজনিত কারণে পূর্ব পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত স্বল্প জিডিপি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে স্বল্পতর হয়ে পড়ে (দেখুন: লেখচিত্র ১)

লেখচিত্র ১: ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জি ডি পি)-এর প্রবণতা
(বর্তমান বাজার মূল্যে, কোটি ডলারে)

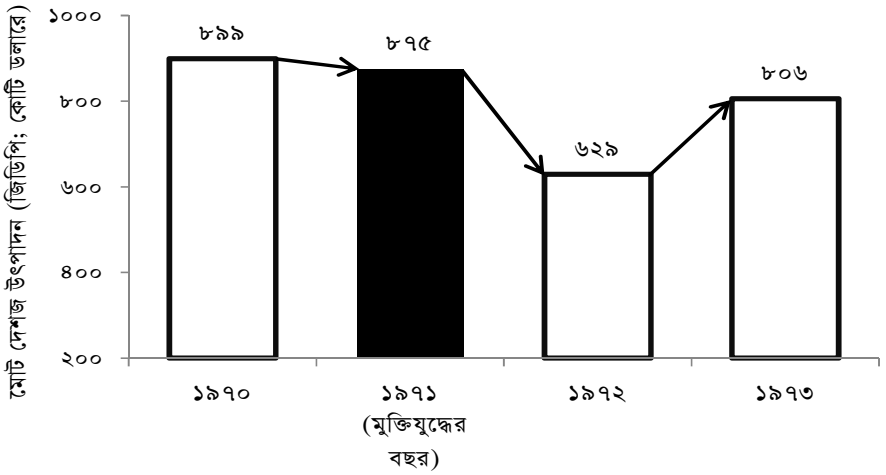

শুধু তাই নয়– যে বিষয়টি এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট মাত্রায় অনুল্লিখিত, স্বল্প গবেষিত ও অবিশ্লেষিত রয়েই গেছে তাহলো মুক্তিযুদ্ধে যে ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হলেন তারা আসলে কারা, কোন শ্রেণি-পেশার, কোন বয়সের, গ্রামের কতজন আর শহরের কতজন? আমার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যে ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হলেন তাদের মধ্যে কমপক্ষে ২৫ লক্ষ হবেন গ্রামের মানুষ। আর বাদবাকী ৫ লক্ষ শহরের ছাত্র-যুবক-কারখানার শ্রমিকসহ অন্যান্য বিভিন্ন পেশার মানুষ[১৭]। একেবারেই স্বল্প গবেষিত অথবা আমার জানামতে আদৌ গবেষিত নয় এবং তথ্য-উপাত্তের নিরিখে একেবারেই আমাদের অজানা আরো একটি বিষয় আছে। আর তা হলো গ্রামের যে ২৫ লক্ষ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষক পরিবারের মানুষ এবং যাদের আনুমানিক গড় বয়স হবে ২৫ বছর (অধিকাংশ ২০ থেকে ৫০ বছর বয়স্ক)। এর অর্থ– মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হবার কারণে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো সক্রিয় কৃষি শ্রমশক্তির (active labour force in agriculture) এক বৃহৎ অংশ যা প্রতিস্থাপনের ক্ষমতা কারো নেই। আর তাদের মৃত্যুতে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কৃষি নির্ভর দেশে কৃষকের অভাবে কৃষিকাজ নিশ্চিতভাবেই বিঘ্নিত হল। এখানেই শেষ নয়। গ্রাম-শহর নির্বিশেষে যে তরতাজা যুবকটি ২৫ বছর বয়সে আত্মত্যাগ করলেন-শহিদ হলেন তিনি তো জীবিত থাকলে দেশের অর্থনীতি ও সমাজে কমপক্ষে আরো ৩৫-৪০ বছর অবদান রাখতে পারতেন। এ ক্ষতির মূল্য কত?[১৮] যে মানুষটি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হলেন অথবা চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেলেন তার পরিবারের সংশ্লিষ্ট ক্ষতি-মূল্য (ক্ষতি-মূল্য বলতে **price** of loss or damage বললে ভুল হবে, বলতে হবে **value** of loss or damage) কত এবং কত ধরনের? সবকিছু মিলে শুধু মোট দেশজ উৎপাদনই (জিডিপি) কমলো না, জিডিপি বৃদ্ধির হারও কমে গেলো (দেখুন, লেখচিত্র ২)। অর্থাৎ এককথায় মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে জিডিপি কমলো, আর সেই সাথে জাতীয় সম্পদ (National Wealth) ও জাতীয় স্টক (National Stock) হ্রাস পেলো। এ অবস্থায় যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে পুনর্বাসন, নির্মাণ-পুনঃনির্মাণ, গঠন-পুনঃগঠন সংশ্লিষ্ট কর্মযজ্ঞ নিঃসন্দেহে সহজ কোনো বিষয় ছিলো না। দূরদর্শী দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু অভূতপূর্ব কঠিন এ কাজটি শুরু করলেন। জাতি-রাষ্ট্র গঠনে শুরুটা ছিল যেমন জরুরি তেমনি এ ছিল অসম্ভব দুরূহ এক কর্মযজ্ঞ।

[১৬] দেখুন: জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে ১৯৭২ সালের ২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ।

[১৭] উল্লেখ্য যে, ১৯৭১-এর সমসাময়িক সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৯২ শতাংশ ছিল গ্রামে বসবাসরত মানুষ আর বাদবাকী মাত্র ৮ শতাংশ ছিলো শহরের মানুষ।

[১৮] তবে সময় আসবে যখন মুক্তিযুদ্ধে আমাদের এ ক্ষতির মূল্য পাকিস্তানকে পরিশোধ করতে হবে। কারণ সভ্য সমাজে দেরিতে হলেও ঐতিহাসিক সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়– সেটাই ইতিহাসের বিধি। যারা এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন তাদের বলবো আজ থেকে ২০ বছর আগে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সম্ভাবনার কথা ভাবুন।

লেখচিত্র ২: ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জি ডি পি)-এর প্রবণতা
(২০০০ সালের স্থির মূল্যে, কোটি ডলারে)

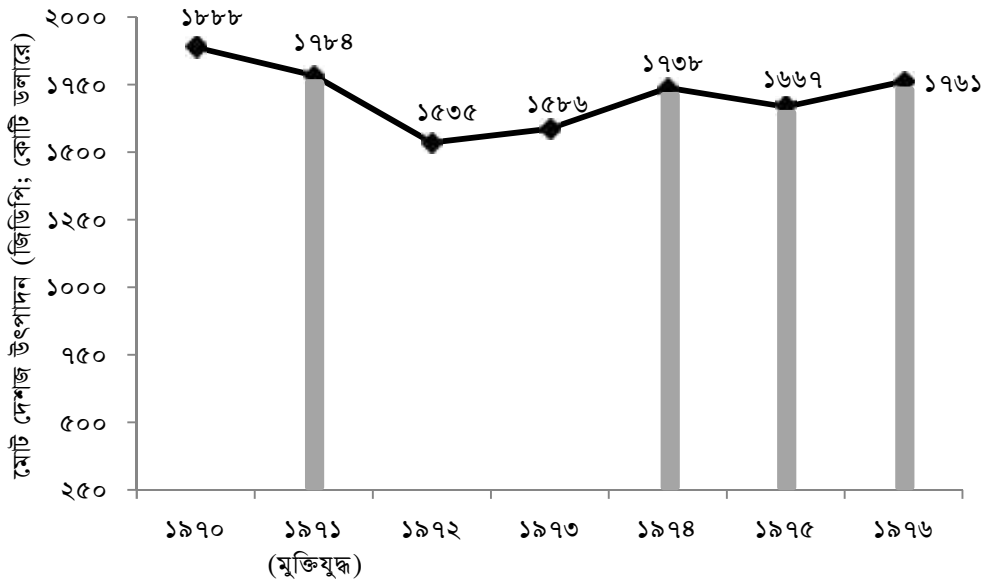

বঙ্গবন্ধু– যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মানুষের পুনর্বাসন; অর্থনীতি, সমাজ, সরকার ও জাতি-রাষ্ট্র গঠন-পুনর্গঠন, পুনঃনির্মাণ-বিনির্মাণসহ পর্বতসম যে গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন এ প্রসঙ্গে আরো দুটি গুরুত্ববহ বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। বিষয় দুটো হলো (১) ১৯৭১-এর আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কি প্রচলিত অর্থের যুদ্ধ ছিল? (২) যুদ্ধে বাংলাদেশে কি কি ক্ষতি, কত ধরনের ক্ষতি, কি মাত্রায় ক্ষতি হয়েছিলো এবং ক্ষয়-ক্ষতির ধরনভেদে ক্ষতি মূল্য কত? প্রথমত, আমাদের ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধ কোনো অর্থেই প্রচলিত অর্থের যুদ্ধ ছিল না। প্রচলিত অর্থের যুদ্ধ হলো আনুষ্ঠানিকভাবে একপক্ষ অন্যপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে– যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধ ইত্যাদি। এর বিপরীতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী: পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলিতে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের হাতে সরকার গঠনের ক্ষমতা না দিয়ে নয়া উপনিবেশিক পাকিস্তানি সেনাশাসকেরা আমাদেরই উপর চাপিয়ে দেয় যুদ্ধ; যুদ্ধটি আমাদের জন্য ছিলো আত্মরক্ষার যুদ্ধ; যুদ্ধটি ছিলো অন্যায়-বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমাদের ন্যায় প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ, অধিকার আদায়ের যুদ্ধ; যুদ্ধটি রূপান্তরিত হয়েছিলো জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে (National Liberation War)। অন্তত দুটো কারণে এ কথাগুলো বলা জরুরি: (১) আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা কখনও পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিনি; উল্টোটা সত্য– পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিলো, এবং (২) যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈর সেনা শাসকেরা আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল (বললো "জং জারি হ্যায়") এবং যেহেতু সে যুদ্ধে তারা পূর্ব পাকিস্তানের বর্ণনাতীত ক্ষয়-ক্ষতি করেছে সেহেতু চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতিসমূহ তাদেরকেই পূরণ করতে হবে– কোনো না কোনো দিন। যে ক্ষয়-ক্ষতির আংশিক হিসেব উপরে উল্লেখ করেছি আর নীচে এ বিষয়ে যে বর্ণনা-বিশ্লেষণ দিচ্ছি এসবের অনেক কিছুই হয়তোবা অসম্পূর্ণ; প্রকৃত ক্ষয়-ক্ষতির অংশ মাত্র। যে কারণে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সামগ্রিক ও বহুমুখী ক্ষয়-ক্ষতির ও ক্ষয়-ক্ষতির মোট মূল্যমান নিরূপণে পূর্ণাঙ্গ নির্মোহ গবেষণা নৈতিক-ঐতিহাসিকভাবেই খুব জরুরি বলে আমি মনে করি। তবে পাশাপাশি এটাও মনে করি যে অনেক ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি আছে যা অপূরণীয়-অপরিমেয় এবং যার অর্থমূল্য নিরূপণ দুরূহ।

আসা যাক দ্বিতীয় বিষয়ে। অর্থাৎ পাকিস্তানি সেনাশাসকরা আমাদের উপর ১৯৭১ সালে যে যুদ্ধ চাপিয়ে দিলো তার ফলে ৯ মাসে (মার্চ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত) আমাদের অর্থনীতি ও সমাজে কি কি ক্ষতি হলো, কত ধরনের ক্ষতি হলো, এবং ধরন অনুযায়ী ক্ষতি মাত্রা কত? আর ক্ষয়-ক্ষতির ধরনভেদে অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবারে তার প্রত্যক্ষ অভিঘাতের স্বরূপ কি? ঐসব ক্ষয়-ক্ষতির হিমালয় পর্বতসম বোঝা ঘাড়ে নিয়ে রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু দেশ গঠনের কাজ শুরু করলেন। ক্ষয়-ক্ষতি যা হলো সেসবের প্রকৃত মর্মবস্তু নিম্নরূপ:

ক) ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হলেন যা ১৯৭১ সালে মোট জনসংখ্যার ৪ শতাংশ অর্থাৎ প্রতি ২৫ জনে ১ জন শহিদ (যাদের অধিকাংশের বয়স ২০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে; আর গড় বয়স হবে ২৫ বছর)। এ ক্ষতি বংশ

পরম্পরা; এ ক্ষতি শহিদ পরিবারের আর্থিক ও মানসিক বিপর্যয় ঘটালো। এ ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ আর্থিক ও সামাজিক মূল্য-অর্থমূল্য নিরূপণ অসম্ভব। এ ক্ষতি অপূরণীয়-অপরিমেয়।

খ) সরকারি হিসেবে ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতহানি-সম্ভ্রমহানি হলো। আসলে এ সংখ্যাটি হবে আরো অনেকগুণ বেশি– আমার হিসেবে কমপক্ষে ১০ লক্ষ[১৯] যা ১৯৭১ এর মোট নারী জনসংখ্যার (৩ কোটি ৬০ লক্ষ) প্রায় ৩ শতাংশ অর্থাৎ বয়স নির্বিশেষে প্রতি ৩৩ জন নারীর একজন ধর্ষণ-ইজ্জতহানি-সম্ভ্রমহানির শিকার হয়েছেন। আমাদের এই ১০ লক্ষ মা-বোনকে ধর্ষণসহ সম্ভ্রমহরণ ও ইজ্জতহানির ক্ষতি-মূল্য কত? এতো গেলো ধর্ষিত-ইজ্জতহারা-সম্ভ্রমহারা নারীর সংখ্যাগত (অর্থাৎ just number of women) দিক। আমরা জানি পাকিস্তানি বর্বর-অসভ্য সেনাবাহিনী আর তাদের এদেশিয় দালাল-দোসর 'রাজাকাররা' নারীর সম্ভ্রমহানি-ইজ্জতহানির মত বর্বরতম এ কাজটা করেছিল হয় তাদের ক্যাম্পে, না হয় তাদের দালাল-দোসরদের বাড়িতে অথবা কোনো স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালতে অথবা ইজ্জত-সম্ভ্রমহারা মা-বোনের বাড়িতেই, অথবা এসবের একাধিক স্থানে। যে প্রশ্নটি আমার জানা মতে এ পর্যন্ত কেউই উত্থাপন করেননি তাহলো ১০ লক্ষ নারী ধর্ষণ-সম্ভ্রমহারা-ইজ্জতহারা হলেন কিন্তু কতবার-কত দফা (অর্থাৎ number of incidents) আমাদের এই মা-বোনেরা ধর্ষণ-ইজ্জতহানি-সম্ভ্রমহানির শিকার হয়েছেন। এ হিসাব কেউই করেননি। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মা-বোনেরা ধর্ষিত হলেন, ইজ্জতহানীর শিকার হলেন, সম্ভ্রম হারালেন এ বিষয়ে সংখ্যাগত দিক নিয়েই যখন তেমন কোনো গবেষণাই হয়নি (অথবা এ নিয়েও এখনও যথেষ্ট কুটতর্ক চলে) তখন মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে মোট কতদফা-কতবার ঐ জঘন্যতম হিংস্র ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে গবেষণার প্রশ্নই উঠে না। অজানা কোন কারণে এ বিষয়ের গবেষণা আমরা সযত্নে এড়িয়ে গেছি। সমাজ গবেষক, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক, ইতিহাস রচয়িতারা এ বিষয়ে দেশ-জাতি-সমাজের কাছে তাদের দায়বদ্ধতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে আমি কুড়িগ্রামে ৪টি গ্রামসহ (কালে, নীলকণ্ঠ, পলাশবাড়ী, মুকতারাম) অন্যান্য জেলার কয়েকটি গ্রামে দ্রুত জরিপে (rapid survey) যা পেয়েছি সেই হিসেবে ধর্ষণ-ইজ্জতহানি-সম্ভ্রমহানির শিকার মোট মা-বোনদের সংখ্যা হবে ১০ লক্ষ আর মোট দফা হবে ১ কোটি ২০ লক্ষ দফা বা বার। এসব মা-বোনেরা পরবর্তীকালে সামাজিক, পারিবারিক ও মনস্তাত্বিকভাবে কি অবস্থায় দিনাতিপাত করেছেন এবং করছেন? এর তো বংশপরম্পরা প্রভাব-অভিঘাত আছে? সামাজিক বঞ্চনাসহ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এমন কি কোনো বিশেষায়িত শাখা প্রশাখা আছে যা এ ধরনের ক্ষতির মূল্যমান ও প্রকৃত অভিঘাত নিরূপণ করতে পারে? আমার জানামতে নেই। তবে সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ইতিহাসটা জানা জরুরি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আন্তঃবিষয়ক বহুশাস্ত্রীয় (multidisciplinary) গবেষণা কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া জরুরি। ঐতিহাসিক কারণেই এ গবেষণা হতে হবে রাষ্ট্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং এ কাজে দেরি করা আদৌ সমিচিন হবে না।

গ) মুক্তিযুদ্ধে ৪৩ লক্ষ ঘরবাড়ি (অর্থাৎ প্রতি পাঁচটি বাড়ির একটি বাড়ি) পূর্ণ অথবা আংশিক জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মিভূত করা হলো; ৩ কোটি মানুষকে সর্বস্বান্ত করা হলো (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ)। কমপক্ষে ১ কোটি নিরিহ মানুষকে (অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ১৩.৩ শতাংশ) দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হলো (যারা ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলো) এবং লুণ্ঠন করা হলো তাদের ফেলে যাওয়া সব সম্পদ আর সাথে নেয়া সম্পদ লুট করা হলো ভারত যাবার পথে বাংলাদেশের মাটিতেই, আর যারা দেশের ভিতরে থেকে গেলেন তাদের ব্যাপকাংশ হলেন পাকসেনা ও তাদের দোসরদের হরিলুটের শিকার[২০]। কি দোষ এসব নিরীহ মানুষের? দোষ একটাই– কেন তারা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক? আরো বড় দোষ– কেন তারা "জয় বাংলা" স্লোগান দেন? তার

---

[১৯] মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী এবং/অথবা তাদের এদেশিয় দালাল-দোসর কর্তৃক ধর্ষিত-ইজ্জতহারা-সম্ভ্রমহারা হতদরিদ্র ১৬ জন প্রবীণ নারীকে কুড়িগ্রাম সদরের উপকণ্ঠের ৪টি গ্রামে (কালে, নীলকণ্ঠ, পলাশবাড়ী, মুকতারাম) রাষ্ট্রিয় মালিকানাধীন জনতা ব্যাংকের সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আওতায় তাদের দরিদ্রাবস্থা নিরসনের ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে গত ২২ মে ২০১৪ তারিখে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা দিতে গিয়েছিলাম (এ হলো মুক্তিযুদ্ধের ৪৩ বছর পরে ৭১-এ ইজ্জতহারা-সম্ভ্রমহারা নারীর পুনর্বাসন!)। একই সাথে ঐ ৪টি গ্রামে পাকবাহিনী ও তাদের দালাল-দোসর (রাজাকার, আলবদর, আল শামস, শান্তি কমিটি) কর্তৃক ইজ্জতহানি ও ধর্ষণের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণে একটি র‍্যাপিড সার্ভে (দ্রুত জরিপ) মূলক গবেষণা পরিচালনসহ এলাকাবাসিদের সাথে কথাবার্তা বলে যে সংখ্যা পেলাম তাহলো ১৯২ জন। অর্থাৎ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিত-সম্ভ্রমহারা-ইজ্জতহারা নারীর সংখ্যা ঐ চারটি গ্রামে ১৬ জন নয়, প্রকৃত সংখ্যা তার চেয়ে ১২ গুণ বেশি। আমরা এও উদঘাটন করলাম যে সামাজিক, পারিবারিক ও মনস্তাত্বিক বিভিন্ন কারণে প্রকৃত ধর্ষিত-সম্ভ্রমহানির শিকার নারীদের ৮৪ শতাংশ অমানবিক ইতিহাসের জঘন্যতম এ বিষয়টি গোপন রাখতে বাধ্য হয়েছেন। যুক্তির খাতিরে যদি ধরেই নেই যে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কুড়িগ্রামের ঐ চারটি গ্রামে পাকবাহিনী আর তাদের দালাল-দোসররা নারীদের সম্ভ্রমহানি-ধর্ষণ-ইজ্জতহানি দ্বিগুণ বেশি মাত্রায় ঘটিয়েছিলো সেক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি কোনোভাবেই ২ লক্ষ হবে না, তা হবে কমপক্ষে ১০ লক্ষ। সংশ্লিষ্ট বিধায় এ বিষয়ে আমার একান্ত ব্যক্তিগত ধারণা হিসেবে উত্থাপন প্রয়োজন বোধ করি যে '৭১এর মুক্তিযুদ্ধে আমাদের যে ১০ লক্ষ (আমার হিসেবে) মা-বোন পাকবাহিনী ও তাদের দালাল-দোসর কর্তৃক ধর্ষিত হলেন, যাদের ইজ্জত-সম্ভ্রমহানী হলো তাদেরকে "বীরাঙ্গনা" হিসেবে অভিহিত করা অন্তত আমাদের পিতৃতান্ত্রিক, প্রগতিহীন, ধর্মীয় কুসংস্কারপূর্ণ সমাজে সঠিক নয়; তা পূর্ণমাত্রায় অযৌক্তিক। বাংলাভাষা তো এতো দুর্বল ভাষা নয়? আমাদের এসব মা-বোনদের (প্রস্তাব হিসেবে বলছি) কেন "বীর নারী মুক্তিযোদ্ধা" অথবা "বীর মুক্তিযোদ্ধা" অথবা সমজাতীয় কোনো অভিধায় অভিহিত করা হচ্ছে না। কোন অধিকারে আমরা মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিত, সম্ভ্রমহানীর শিকার আমাদের মা-বোনদের সবার সামনে সমাজে হেয় করছি? পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আর তার দোসররা অনেকেই তো ছিল সমকামী; তারা তো অনেক পুরুষকেও ধর্ষণ করেছে– একথা তো মিথ্যা নয়। সেক্ষেত্রে ধর্ষিত পুরুষদের সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করতে কি শব্দ-অভিধা ব্যবহার করবেন এবং করেন না কেনো?

[২০] এখানে উল্লেখ্য যে এই হরিলুটের একাংশই কিন্তু পরবর্তীকালে মৌলবাদের অর্থনীতি বিনির্মাণে জামায়াতে ইসলাম কর্তৃক পুঁজির আদি সঞ্চয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি, জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা ২০১২, ঢাকা: ২৬ জুন)।

চেয়েও বড় দোষ– কেন তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা মানেন? তাদের তো জাতির পিতা হবার কথা জনাব কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেব!

নিরীহ মানুষের সারা জীবনের সঞ্চিত শ্রমে গড়া ৪৩ লক্ষ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মিভূত করে ৩ কোটি মানুষকে সর্বস্বান্ত করা, আর ১ কোটি শরণার্থীসহ কয়েক কোটি মানুষকে নিঃস্ব মানুষে রূপান্তরের অর্থমূল্য কত এবং এসবের বংশপরম্পরা প্রভাব-অভিঘাত কত ধরনের? মুক্তিযুদ্ধ ৪৩ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে এখনও পর্যন্ত এসব আমাদের অজানাই রয়ে গেলো! পাকিস্তানকে এসবের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনাসহ সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ নিয়ে দেশে নতুন করে আন্দোলন-সংগ্রামসহ বিশ্বব্যাপি মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে কার্যকর কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা আমাদের ঐতিহাসিক নৈতিক দায়িত্ব।

ঘ) মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী নিধন (২৫-২৬ মার্চ– দার্শনিক জে সি দেবসহ অন্যান্য), শেষের দিকে (যেমন, বিজয়ের ২ দিন আগে, ১৪-১৬ ডিসেম্বর) এমনকি পরবর্তী সময়ে জহির রায়হানসহ অনেককে হত্যা-গুম এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে অসংখ্য শিক্ষক হত্যা– বিষয়টি এককথায় স্বাধীন বাংলাদেশকে পরিকল্পিতভাবে মেধাশূন্য করার পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র। এ ক্ষতি অপূরণীয়-অপরিমেয়-অপরিশোধেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানিদের এ পরিকল্পনাটি মুক্তিযুদ্ধের ৪০ বছর পরেও যে বহাল আছে (হয়তো রূপ পরিবর্তন হয়েছে) তার অনেক প্রমাণ আছে, যার মধ্যে অন্যতম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাহিত্যিক-ঔপন্যাসিক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের হত্যা। আমার ধারণা অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে ভবিষ্যতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে মেধাশূন্য করার প্রক্রিয়া জোরদার হবে। মৌলবাদের শক্ত অর্থনৈতিক ভিত, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও তাদেরই সশস্ত্র জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনের সরব উপস্থিতি এসব সম্ভাবনা প্রমাণে যথেষ্ট।

ঙ) জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে পোড়া মাটিতে রূপান্তর করা হলো ১৮ হাজার প্রাইমারি স্কুল, ৬ হাজার হাইস্কুল ও মাদ্রাসা, ৯০০ কলেজ ভবন। বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যত বন্ধ করে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য বাংলাদেশে মানব সম্পদ সৃষ্টির প্রধান উপাদান শিক্ষাকে নির্মূল করা। এ ক্ষতির আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষতি-মূল্য কত? স্কুল-কলেজ জ্বালাও-পোড়াও ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে পাক-বাহিনী আরো ভিন্ন ধরনের ক্ষতিও করেছে– যা আজ পর্যন্ত অনুদঘাটিতই রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী জিয়াউর রহমানের সরকারের আমলে শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত গোপন একটি প্রতিবেদনে মুক্তিযুদ্ধের আগের বছরের তুলনায় (১৯৬৯-৭০) মুক্তিযুদ্ধের বছরে (১৯৭১) বিভিন্ন স্তরের ও ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং সেইসাথে ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (enrolment) সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত দেয়া হয়েছে।[২১] ঐ প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে (১৯৭১ সাল) মুক্তিযুদ্ধের আগের বছরের তুলনায় মূলধারার সকল ধারার সকল স্তরের স্কুল-কলেজের সংখ্যা এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বিশেষ করে ছাত্রী সংখ্যা কমেছে, আর বেড়েছে মাদ্রাসার সংখ্যা বিশেষ করে হাফিজিয়া ও ফোরকানিয়া কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা এবং ঐসব মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা। ১৯৭১ সালে ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় সব ধরনের মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা কমেছে ৫৭ শতাংশ (২,৬৯৫ থেকে দাঁড়িয়েছে ১,৭৭৪টিতে); প্রাথমিক পর্যায়ের মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা কমেছে ১২৯ শতাংশ; জুনিয়র মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যা কমেছে ১২.৪ শতাংশ আর ছাত্রী সংখ্যা কমেছে ২২ শতাংশ; মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কমেছে ৭ শতাংশ (মোট ৮৬,১৭৮); নবম ও দশম শ্রেণিতে ছাত্র সংখ্যা কমেছে ১৪.২ শতাংশ আর ছাত্রী সংখ্যা কমেছে

[২১] গোপন ঐ প্রতিবেদনটির শিরোনাম "Annual Report on Public Instruction for the Year 1970-71", গোপনীয় (Confidential, for official use only)। প্রতিবেদনটির প্রকাশক হিসেবে উল্লেখ আছে: Education Directorate, People's Republic of Bangladesh. গোপনীয় এ প্রতিবেদনটির প্রকাশকাল ১৯৭৮ সাল। আবারো স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন (গোপনীয়) প্রকাশকাল ১৯৭৮ সাল; ক্ষমতার মসনদে জিয়াউর রহমান। একদিকে রিপোর্টটির তথ্য প্রকৃত সত্যকে গোপন করেছে (অন্তত ১৯৭১ সালে মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা জোর করে বেশি দেখানো হয়েছে তার পরও সত্যের প্রবণতা লুকানো সম্ভব হয়নি) অন্যদিকে তখন (১৯৭৮ সালে) জিয়াউর রহমান রাজাকার পুনর্বাসনে ব্যস্ত বিধায় মন্ত্রীসভায় রিপোর্টটি কখনও উপস্থাপন করা হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী সময় থেকেই আমরা মোটামুটি খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছি যে দেশে দু'ধরনের মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন– প্রথম ধরন হলো 'স্বেচ্ছায় মুক্তিযোদ্ধা' (Freedom Fighter by Choice) আর দ্বিতীয় ধরনটি হলো "ঘটনাচক্রে মুক্তিযোদ্ধা" (Freedom Fighter by Chance)। জিয়াউর রহমান ছিলেন দ্বিতীয় ধরনের মুক্তিযোদ্ধা। এখানে সঙ্গত কারণেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ-ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে দেশের ৯৯ শতাংশ মানুষই ছিলেন হয় প্রত্যক্ষ-সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা অথবা নিরস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা অথবা সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা অথবা মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহানভূতিশীল মানুষ– এরা সবাই মুক্তিকামি মানুষ, মুক্তিযোদ্ধা। আর বড়জোর ১ শতাংশ মানুষ হবেন পাক-বাহিনীর দালাল-দোসর অথবা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল– এদের সবাইকে এককথায় 'রাজাকার' বলা হয়। যে কারণে আমি মনে করি একবার রাজাকার মানে সারাজীবন রাজাকার, আর একবার মুক্তিযোদ্ধা মানে সারাজীবন মুক্তিযোদ্ধা নাও হতে পারে (Once Rajakar– Rajakar forever, once Muktijuddha may not be Muktijuddha forever)। জিয়াউর রহমান-মুশতাক-তাহেরউদ্দিন ঠাকুর-মাহবুবুল আলম চাষী ওরা তো ১৯৭১ এ 'মুক্তিযোদ্ধা' ছিলেন, আর পরে করলেনটা কি? যার নাম নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করলেন সেই জাতির পিতাকেই তারা হত্যা করলেন! পাশাপাশি এ প্রশ্ন সঙ্গত যে, রাজাকার-আলবদর-আল শামস-শান্তি কমিটির কেউ কি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বিগত চার দশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণে সচেষ্ট হয়েছেন? হননি, হবেন না।

১৮.৬ শতাংশ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা কমেছে ৩৭ শতাংশ আর ছাত্রী সংখ্যা কমেছে ৪০ শতাংশ। শুধুমাত্র বেড়েছে মাদ্রাসার সংখ্যা। আর কওমি মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে ৪৯ শতাংশ। আগেই বলেছি যে, যে প্রতিবেদনে এসব তথ্য-উপাত্ত দেয়া হয়েছে প্রতিবেদনটি জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৭৮ সালে প্রণীত কিন্তু গোপন এবং অপ্রকাশিত। এসব তথ্য-উপাত্ত যা নির্দেশ করে তাহলো মুক্তিযুদ্ধের সময় মেয়েরা প্রধানত দুটো কারণে স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করেছিলো (১) ভীতি ফ্যাক্টর: পাক-বাহিনী ও তাদের দালাল-দোসরদের হাতে পড়ে ইজ্জত-সম্ভ্রমহানির ভীতি, (২) মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তান সরকার আদর্শগতভাবেই ছিল নারী শিক্ষা বিরোধী। আর ছেলেরা যে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করলো তার প্রধান দুই কারণ হলো: (১) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ, (২) ভীতি ফ্যাক্টর যে কখন কোথা থেকে ধরে নিয়ে গুলি করে মারে। আর এ সবের পাশাপাশি যে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যার দ্রুত উত্থান ঘটলো তার পিছনে প্রধান কারণ হলো ঐসব ছাত্রদের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দালাল-দোসর সৃষ্টির কারখানা বানিয়ে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ব্যবহার করা।

চ) মুক্তিযুদ্ধের সময় ৩ হাজার অফিস ভবন ধ্বংস করা হয়। কি দোষ এসব অফিস ভবনের যে অফিস ২৩ বছর ধরে মূলত পাকিস্তানিদের সেবা করেছে? তবুও ধ্বংস করা হলো, সম্ভবত শুধু এ কারণেই যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনে অফিস নামক বাড়ি-ঘর যেন না থাকে।

ছ) গ্রামের ১৯ হাজার হাট-বাজার পুড়িয়ে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য হল গ্রামের অর্থনীতিতে পণ্য বেচা-বিক্রি বন্ধ করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়া। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে পণ্য বিনিময় দীর্ঘ দিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেলে একদিকে যেমন মানুষ অর্থকষ্টে ভুগবেন ফলে তাদের পাকিস্তানিদের দালাল-দোসর হবার সম্ভাবনা বাড়বে, আর অন্যদিকে দেশজ উৎপাদন-বণ্টন-বিনিময় ব্যবস্থাটাই অকেজো হয়ে পড়বে। ধ্বসে যাবে অর্থনীতির মেরুদন্ড।

জ) মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টাতেই খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রায় বন্ধ ছিল বলা চলে। পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের পদলেহি রাজাকার-দালালরা গ্রামের মানুষের কয়েক লক্ষ হালের বলদ ও গাভী জবাই করে গোশত খেয়েছে। আর গবাদি পশুর অভাবহেতু দেশের কোনো কোনো এলাকায় সুযোগ আর ইচ্ছে থাকলেও কৃষক হাল চাষ করতে পারতো না। তা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে ১৯ হাজার হাট-বাজার পুড়িয়ে দেয়াসহ কৃষকের আয়-উপার্জন ব্যাহত হওয়ায় কৃষকের হাতে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করে চাষাবাদ করার মত কোনো টাকা-পয়সাও ছিল না। এর পাশাপাশি এ কৃষককুলের একাংশ যেমন একদিকে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র অংশগ্রহণ করেছে আর প্রায় সবাই (কয়েকটি রাজাকার-শান্তিকমিটির দালাল বাদে) তাদের পরিবারের ভোগের জন্য যে যৎসামান্য খাদ্য মজুত ছিল তা দেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের স্বেচ্ছায়-সচেতনভাবেই সরবরাহ করে নিজেরা রিতিমতো উপোস করেছে অথবা অর্ধভুক্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করেছে। আমার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে স্বেচ্ছায় সহায়তাকারী দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত এসব কৃষকের সংখ্যা হবে তৎকালীন গ্রামীণ জনসংখ্যার কমপক্ষে ৯৫ শতাংশ মানুষ অর্থাৎ ৬ কোটি ২০ লাখ মানুষ (গ্রাম-শহর মিলে সারা দেশের জনসংখ্যা যখন ৭ কোটি ৯ লাখ)[২২]। কৃষিসহ খাদ্যশস্যের সার্বিক চিত্র যা তুলে ধরলাম তার পুর্ণাঙ্গ রূপ দিতে যা যোগ করতে হবে তা হলো: মুক্তিযুদ্ধের সময়ে একদিকে খাদ্যশস্য উৎপাদন চরমভাবে বিঘ্নিত হলো, আর অন্যদিকে পাকহানাদার বাহিনী পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্তে তাদের 'পোড়ামাটি নীতি' বাস্তবায়নে সরকারি গুদামের মজুদ খাদ্যশস্য, শস্যবীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ এবং চাষের মাঠের গভীর ও অগভীর নলকূপ ধ্বংস করে দিলো। তাহলে মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে বাংলাদেশের গ্রাম যে অবস্থায় এসে দাঁড়ালো তা হলো নিদেনপক্ষে এরকম: গ্রামের মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হলো, চাষাবাদের উপকরণ ধ্বংস হয়ে গেলো, এবং আগেই যা বলেছি মুক্তিযুদ্ধে শহিদ অথবা পঙ্গুত্ববরণের কারণে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট পরিবারে অপরিমেয়-অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতি হলো তাই নয় ক্ষয়-ক্ষতিটা হলো বংশপরম্পরা। এসবই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বছরে (১৯৭১) মুক্তিযুদ্ধের আগের বছরের (১৯৭০) তুলনায় এবং মুক্তিযুদ্ধের বছরের তুলনায় মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বছর মোট দেশজ উৎপাদন হ্রাস করলো (লেখচিত্র ১ ও ২)।

[২২] ১৯৭১ এ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিলো ৭ কোটি ৯ লক্ষ যার মধ্যে গ্রামের জনসংখ্যা ৬ কোটি ৫২ লক্ষ (অর্থাৎ তৎকালীন জনসংখ্যার প্রায় ৯২ শতাংশ)। গ্রামের জনসংখ্যার কমপক্ষে অর্ধেক অর্থাৎ ৩ কোটি ২৬ লক্ষই ছিলেন ভূমিহীন-নিঃস্ব মানুষ। এসব ভূমিহীন-নিঃস্ব মানুষের অনেকেই সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, আর বাদবাকিরা প্রায় সবাই মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন– যে যেভাবে পেরেছেন। গ্রামের মানুষ তো বটেই শহরের মানুষও গুটি কয়েক পাকিস্তানি দালালের ভয়-ভীতি-জ্বালাতনে লো–ভলিউমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আর বিবিসি-র সংবাদ শুনেছেন। 'জয় বাংলা' স্লোগানে উজ্জীবিত হয়েছেন। নারী-পুরুষ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিজ সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠালেও মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের মা-বাবা সৃষ্টিকর্তার কাছে যত না নিজ সন্তানের জন্য তার চেয়ে ঢের বেশি প্রার্থনা করেছেন পাকিস্তানের কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধুর জন্য। গ্রামের এসব মানুষ নিঃস্বার্থভাবে এসব করেছেন শুধুমাত্র দেশ স্বাধীন করার জন্য কিন্তু তারা কেউ জানতেন না কি উপায়ে দেশ স্বাধীন হবে, কবে দেশ স্বাধীন হবে।

মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক-বিস্তৃত-সর্বাত্মক ধ্বংসের কারণে ১৯৭০ সালের তুলনায় ১৯৭২ সালে মোট দেশজ উৎপাদন ৩০ শতাংশ হ্রাস পেলো। লেখচিত্র ১ স্পষ্ট দেখায় যে ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট দেশজ উৎপাদন (বর্তমান বাজার মূল্যে জিডিপি) ছিলো ৮৯৯ কোটি ডলার যা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থায় ১৯৭২ সালে কমে দাঁড়ালো ৬২৯ কোটি ডলারে। তবে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন অগ্রাধিকারভিত্তিক পদক্ষেপের কারণে মোট দেশজ উৎপাদন বাড়তে থাকলো, যেমন ১৯৭৩ সালে, বর্তমান বাজার মূল্যে তা গিয়ে দাঁড়ালো ৮০৬ কোটি ডলারে। ইতোপূর্বে লেখচিত্র ২-এ ২০০০ সালের স্থির মুল্যে ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত মোট দেশজ উৎপাদন প্রবণতা দেখানো হয়েছে। যেখানে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়: (১) মোট দেশজ উৎপাদন ১৯৭২ সাল থেকে বাড়া শুরু করেছে, (২) ১৯৭৫ সালে ১৯৭৪ সালের তুলনায় কমেছে, যা দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি অচল করার দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের প্রত্যক্ষ ফল (মনে রাখা জরুরি যে ১৯৭৫ সালেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে), (৩) 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে ১৯৭৬ সালে মোট দেশজ উৎপাদন আবারো একটু বেড়েছে– ১৯৭৫-এ ছিলো ১,৬৬৭ কোটি ডলার আর ১৯৭৬ সালে ১,৭৬১ কোটি ডলার। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে অনৈতিক অর্থশাস্ত্রবিদ আর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অশুভ দেশি-বিদেশি রাজনীতিবিদেরা কেউ হয়তো বলবে– "দ্যাখো বঙ্গবন্ধু নেই আর সেজন্যই মোট দেশজ উৎপাদন (১৯৭৬ সালে) বেড়ে গেলো"। নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে এ কথা শুধু যুক্তিহীনই নয় তা অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে বাধ্য। কারণ বঙ্গবন্ধু হত্যার পরের বছর ১৯৭৬ সালে ১৯৭৫ সালের তুলনায় দেশজ উৎপাদনের যতটুকু বৃদ্ধি (লেখচিত্র ২) দেখা যাচ্ছে তা আসলে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সে সবেরই পুঞ্জীভূত ফল। এর বাইরে অন্য যেকোনো বিশ্লেষণ হবে অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিক, অসত্য এবং সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

ঝ) মুক্তিযুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর-দালালরা ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যা, ১০ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রমহানি (যে সংখ্যাটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ২ লক্ষ বলা হয়– যা সত্য নয়), বুদ্ধিজীবী নিধনসহ গ্রামের স্কুল-কলেজ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, দেশের ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে নিঃস্বতর করে শুধুমাত্র যে মানব সম্পদের অপূরণীয়-অপরিশোধেয় বংশপরম্পরা ক্ষতি করে গেলো তাই নয় সেই সাথে ভৌত অবকাঠামোর (physical infrastructure) যে ক্ষয়-ক্ষতি তারা ৯ মাসে করেছে তা সময়ের নিরিখে মানব ইতিহাসে এক বর্বরতম-বিরল দৃষ্টান্ত। ভৌত অবকাঠামোর মৌল উপাদান রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ কোনো কিছুই পাকবাহিনীর ধ্বংস তালিকার বাইরে ছিল না। তারা ধ্বংস করলো ২৭৪টি ছোট-বড় সড়ক সেতু, ৩০০টি রেল সেতু, ৪৫ মাইল রেল লাইনের সম্পূর্ণ অংশসহ ১৩০ মাইল রেল লাইনের অংশ, রেল ইঞ্জিন ও বগি মেরামতের সকল কারখানা, ডুবিয়ে ধ্বংস করলো প্রায় ৩ হাজার মালবাহী নৌকাসহ মাল পরিবহনের সরকারি কার্গো, চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে মাইন পুতে বন্দর ব্যবহার অনুপযোগী করলো, বিমান বন্দরের রানওয়ে ধ্বংস করল, ঢাকার সাথে বিভিন্ন জেলা শহরসহ বিদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করল, যুদ্ধে হেরে যাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ট্রাঙ্ককল ব্যবস্থা ও টেলিফোন সংস্থার নথিপত্র পুড়িয়ে দিল, সারা দেশের বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনসহ অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন করল ও বিদ্যুতের খুটি উপড়ে ফেলল। এ ছাড়াও বন্ধ করে দিল প্রায় সকল কলকারখানা। আর যুদ্ধে হেরে আত্মসমর্পণের ঠিক পূর্বমুহূর্তে আমাদের এখানকার ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত কাগজের নোটসহ নথিপত্র পুড়িয়ে দিল এবং ব্যাংকে গচ্ছিত সোনা লুট করল। সুতরাং স্পষ্ট যে 'পোড়ামাটি নীতি' বাস্তবায়নে মাত্র ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী আর তাদের এ দেশিয় দোসর-দালালরা এ দেশের মানবসম্পদ ও ভৌত সম্পদের যত ধরনের যত রূপের ক্ষয়-ক্ষতি-ধ্বংস সাধন করা সম্ভব সবকিছু করেছে– নির্বিচারে। পৃথিবীতে কোনো যুদ্ধে মাত্র ৯ মাসে একটি জাতির এত ধ্বংস কেউ এর আগে করেছে কিনা আমার সন্দেহ। সম্ভবত এত স্বল্প সময়ে মনুষ্য সৃষ্ট এত ধ্বংসের এটাই সবচে বিরল ইতিহাস। আর এ ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে হাত দিলেন, হাত দিলেন পুনর্বাসন, গঠন-পুনঃগঠন, নির্মাণ-পুনঃনির্মাণের দুরূহ কাজে, এবং শুরুটা করলেন বাংলার মানুষের প্রতি তার অগাধ-অকৃত্রিম আস্থা-বিশ্বাস-ভালবাসা-সহমর্মিতার উপর ভিত্তি করে তারই উদ্ভাবিত "দেশজ উন্নয়ন তত্ত্ব" প্রয়োগ করে। তিনি কি করলেন তা বলার আগে এতটুকু অন্তত বলা উচিত যে প্রায়-অসম্ভব এ কাজে তিনি সর্বসাকুল্যে সময় পেয়েছিলেন মাত্র ১,৩১৪ দিন (বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন-দিল্লি হয়ে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ নৃশংসভাবে পরিবার-পরিজনসহ হত্যার শিকার হন)।

৪। বঙ্গবন্ধুর ১৩১৪ দিন: যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি-সমাজের গঠন-পুনঃগঠন, পুনর্বাসন, নির্মাণ-পুনঃনির্মাণসহ 'সোনার বাংলার' ভিত গঠনে বঙ্গবন্ধু কি করলেন?

মহান মুক্তিযুদ্ধে বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের এ দেশিয় দালাল-দোসররা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের যে ক্ষয়-ক্ষতি করেছিলো– আগেই বলেছি তা শুধু অপূরণীয় ও অপরিমেয়ই নয়, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ, মাত্রা এবং প্রকৃতি যা তা থেকে মাত্র ১৩১৪[২৩] দিনের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে উদ্ভাবন করতে হয়েছিলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক উন্নয়নের এক নতুন দর্শন "স্বদেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শন" (home grown development philosophy)। আর এ দর্শন বাস্তবায়নে তাকে দু'ধরনের বৃহৎ বর্গের কর্মকাণ্ড করতে হয়েছিলো। প্রথমটি, আশু-তাৎক্ষণিক-জরুরি প্রকৃতির এবং কিছুটা বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক-উন্নয়ন বিষয়ক; আর দ্বিতীয়টি, দেশের ভিতরে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি ও সমাজ পুনঃগঠন-পুনঃনির্মাণ-এর মাধ্যমে বলা যায়, জিরো অবস্থা থেকে শুরু করে মুক্ত-স্বাধীন দেশের অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতির উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে তোলা। যা কোনো অর্থেই সহজ কাজ ছিলো না, কারো কারো মতে কাজটি ছিল অসম্ভব।[২৪] তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার (যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ শত্রু ছিলেন)-তো মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশকে 'তলাবিহিন ঝুড়ি' ('Bangladesh is a bottomless basket') আখ্যায়িত করে বলতে চেয়েছিলেন 'কথা তো শুনলে না, দেখি মুজিবুর রহমান সমাজতন্ত্রের নামে তোমাদের কোথায় নেয়'। এ দলে কিসিঞ্জার একা ছিলেন না। আমাদের প্রবীণ (জীবিত-প্রয়াত) অনেক অর্থনীতিবিদদের নমস্য তত্ত্বগুরু জাস্ট ফাল্যান্ড ও জে আর পারকিনসন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে রীতিমতো গুরুগম্ভীর এক পুস্তকই লিখে ফেললেন যার শিরোনাম "Bangladesh: The Test Case of Development" অর্থাৎ বাংলাদেশ-উন্নয়নের এক টেস্ট কেইস। যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয় নিয়ে তারা এ উপসংহারে উপণীত হলেন যে উন্নয়নের তেমন কোনো সম্ভাবনা বাংলাদেশের নেই। ফাল্যান্ড ও পারকিনসন সাহেব ঐ গবেষণা গ্রন্থে যা বললেন তার সারকথা একরকম: "বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১ কোটি হলে ভাল হতো। কিন্তু জনসংখ্যা ৮ কোটি, তাও আবার ক্রমবর্ধমান। সে কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অবস্থা আরো খারাপ হতে বাধ্য (তাদের ভাষায় "certainly get worse, terribly worse")।...মানুষ নয় প্রকৃতিই বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করে।...বাংলাদেশের তেমন কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকলে আর জনসংখ্যা কম হলে বাংলাদেশের উন্নয়ন হয়তো বা সম্ভব হতো।...উপরন্ত আছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা যা বাংলাদেশের উন্নয়ন গতিকে পিছনের দিকে টানছে।...উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশের প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন। আর প্রতিবেশী দেশ ছাড়া বাংলাদেশের কোনো ভৌগলিক-স্ট্রাটেজিক গুরুত্ব নেই"[২৫]। তাদের বিশ্লেষণের শেষ কথাটি এরকম: "বাংলাদেশ যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সফল হতে পারে তাহলে পৃথিবীর যে কোনো দেশই তা পারবে" (ফাল্যান্ড ও পারকিনসন, পৃ: ১৯৭)। আমার মতে ফাল্যান্ড ও পারকিনসন সাহেবের অর্থনৈতিক ভাবনা-দর্শনটি ছিলো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত : তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অনড়-স্থির (static) বিষয় হিসেবে দেখেছেন, প্রকৃত অর্থে উন্নয়ন যে নিয়ত পরিবর্তনশীল চলমান (dynamic) প্রক্রিয়া তা তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। এরকম পণ্ডিতের সংখ্যা কম ছিলো না যারা শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করেছেন। এসবের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের আগে, মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং মুক্তিযুদ্ধের পরে স্বাধীনতা বিরোধী দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র তো ছিলোই। এক্ষেত্রে আমার একটি ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ উল্লেখ না করলেই নয়; অবশ্য ভৌগলিক অথবা অন্যবিধ কোনো যুক্তি ব্যবহার করে যে কেউই আমার পর্যবেক্ষণের সাথে দ্বিমত পোষণ করতেই পারেন (বিষয়টি আমি মুক্তচিন্তা ও তা প্রকাশের স্বাধীনতা হিসেবেই দেখবো)। আমার ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণটি এরকম: ওরা সবাই 'সাদা' মানুষ; সাদারাই কালো মানুষের দেশে উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে শত শত বছর ধরে তাদের উপর অন্যায়, অবিচার, শোষণ, অমানবিক অত্যাচার, নির্যাতন, নিবর্তন করেছে। যে কারণে দেখা যায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আফ্রিকার মুক্তিকামী কালো মানুষ আর ল্যাটিন আমেরিকার অ-সাদা

[২৩] বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে আর তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে। ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ পর্যন্ত হিসেব করলে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন থেকে মোট সময় হয় ১৩১৪ দিন। আর যেহেতু ১৪ই আগস্ট দিবাগত রাত কাটিয়ে ভোর ৫টা ৪০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করা হয় সেহেতু ১৫ই আগস্ট থেকে বঙ্গবন্ধু দেশ পরিচালন করতে পারেননি, সেই হিসেবে উল্লিখিত ১৩১৪ দিন হতে পারে ১৩১৩ দিন।

[২৪] এ প্রসঙ্গে ভারতীয় মেজর জেনারেল (অব.) উবান রচিত "Phantoms of Chittagong: The "Fifth Army" in Bangladesh" গ্রন্থে লিখেছেন "এই যুদ্ধ বাংলাদেশকে ব্যাপক ধ্বংসের মধ্যে ফেলে রেখে গিয়েছিল। তার সকল শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য সম্পদ বিনষ্ট হয়েছিল। বিশ্বের সর্বোত্তম শুভেচ্ছাও যদি মেলে তবু বাংলাদেশের অর্থনীতির টলমলে অবস্থা ঠিক করে তুলতে এক দশক সময় লেগে যাওয়ার কথা ছিল" (গ্রন্থের অনুবাদক হোসাইন রিদওয়ান আলী খান, ২০১৪, পৃ: ১৪০, ঘাস-ফুল-নদী প্রকাশনা, ঢাকা)।

[২৫] দেখুন, জাস্ট ফাল্যান্ড ও জে আর পারকিনসন. (1977). Bangladesh: The Test Case of Development, p. 1-5. New Delhi: S. Chand & Company Ltd।

মানুষদের অগাধ সহানুভূতি। অবশ্য এ কথাও উল্লেখ জরুরি যে ১৯৬০-৭০-এর দশকটি ছিলো আফ্রিকা-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকায় উপনিবেশ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্বর্ণ যুগ। আর সময়ের নিরিখে বিশ্বব্যাপি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এ স্বর্ণযুগের সাথে মিলে গেল বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধামুক্ত, শোষণহীন, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন।

বঙ্গবন্ধু এসব পারবেন কিনা এ নিয়ে সংশয়-সন্দেহ ছিলো অনেকের অনেক কারণে। যার মধ্যে অন্যতম হতে পারে এমন যে, যে মানুষটি ১৯৭৫ সালে হত্যার আগে বড়জোর ৩৬ বছর (১৩ হাজার ১৪০ দিন; বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী অনুযায়ী তার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের শুরু ১৯৩৯ সালে)[২৬] আর ১৯৭১এর মুক্তিযুদ্ধের আগে সক্রিয় রাজনীতির ৩২ বছর (১১ হাজার ৬৮০ দিন) জীবনের ৪০ শতাংশ জেলে কাটালেন, জীবনের ৪৮ শতাংশ সময় কাটিয়ে দিলেন মিটিং-মিছিল-সভা-সমিতি-বক্তৃতা দিয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যায্য আন্দোলনসহ সংগঠন গড়ে তুলতে মানুষের সাথে জীবন্ত যোগাযোগ স্থাপন নিমিত্ত সবধরনের যানবাহনে চড়ে (নৌকা, ট্রেন, জিপগাড়ি, গরুগাড়ি, ঘোড়ারগাড়ি, রিকশা, ভ্যানসহ হাঁটাপথে), যে মানুষটি তার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে মাত্র ১২ শতাংশ সময় (অর্থাৎ দিনে গড়ে ৩-৩.৫ ঘণ্টা) ঘুমানোর সুযোগ পেয়েছিলেন– এ মানুষটি পারবেন কি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে বিনির্মাণ করতে? তিনি যে পেরেছেন এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ-দেশপ্রেমিক-প্রয়োগবাদী-দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে পেরেছেন তা তিনি দেশে ফিরে প্রথম বছরেই ১৯৭২ সালে যা যা করলেন তার মাসওয়ারি খেরোখাতাটি একবার চোখ বুলালেই সহজে বুঝা যায় (দেখুন, ছক ১)।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু উল্লিখিত বৃহৎ বর্গের অন্তর্গত প্রথম যে ধরনের কাজগুলি করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হল: মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে যে সব অস্ত্র ছিলো তা সমর্পন করানো; ভারত ফেরত ১ কোটি শরণার্থিসহ মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন; শহিদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারবর্গকে সহযোগিতা প্রদান; স্বল্প সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন; সরকার পরিচালনে ঔপনিবেশিক আইনব্যবস্থার পরিবর্তন ও বিপর্যস্ত প্রশাসনিক কাঠামোর গণমুখী পরিবর্তনসহ দক্ষ প্রশাসক সৃষ্টি; মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের আটক করে বিচারের আওতায় আনা; বাংলাদেশে অবস্থানকৃত প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ভারতীয় সৈন্যকে ভারতে ফেরত পাঠানো; পাকিস্তানে আটকে পড়া প্রায় ৪ লাখ বাঙালিকে দেশে ফিরিয়ে আনা; প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন; স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট প্রণয়ন; স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের যত দেশ থেকে যত দ্রুত সম্ভব স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন; জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ অর্জন; যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক অনুদান-সহযোগিতা প্রাপ্তির সর্বাত্মক সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা; আন্তর্জাতিক জ্বালানি তেলের বাজারে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব মোকাবেলা; মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র নস্যাতের প্রচেষ্টা; মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির দেশ বিরোধী সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড মোকাবেলা; সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করা; ব্যাংক-বীমা, পাট শিল্পসহ বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ; কৃষকদের খাজনা হ্রাস ও বকেয়া খাজনা মওকুফ ইত্যাদি। ছক ১ এ প্রদর্শিত স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পিত প্রথম বছরের (১৯৭২ সালের) কর্মকাণ্ডের মাসওয়ারি খেরোখাতা শুধু একটি তালিকা মাত্র নয়– তালিকায় কর্মকাণ্ডের যুক্তি পরম্পরা অনুধাবন না করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিচার অসম্পূর্ণ হবে। এ তালিকাটি বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টিসহ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পরিচালনে অগ্রাধিকারক্রম বিবেচনায় তার মেধা-মনন, প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেমের সুস্পষ্ট পরিচায়ক।

ছক ১: যুদ্ধবিধবস্ত দেশে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের প্রথম বছরেই (১৯৭২ সালে) বঙ্গবন্ধু অগ্রাধিকারভিত্তিতে যে সকল পদক্ষেপ নিলেন তার মাসওয়ারি খেরোখাতা

গৃহীত মূল পদক্ষেপসমূহ	মাস (১৯৭২ সালে)											
	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
১। মন্ত্রীসভা গঠন (১২ সদস্যবিশিষ্ট)												
২। মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে নির্ধারিত হয়: জাতীয় পতাকা; জাতীয় সঙ্গীত; রণসঙ্গীত												
৩। শরণার্থী পুনর্বাসন ও দেশের অভ্যন্তরে ৪৩ লক্ষ বাসগৃহ পুনর্নির্মাণে ত্রাণ কমিটির রূপরেখা প্রণয়ন												
৪। ভারতীয় সৈন্যদের দেশে ফেরত												
৫। মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন												
৬। শহিদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন												
৭। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের বিচারের জন্য "বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অধ্যাদেশ" প্রণয়ন												
৮। [illegible]												
৯। ধ্বংস প্রাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠন/পুনর্নির্মাণ												
১০। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা												
১১। কৃষি পুনর্বাসন												
১২। ১৩৯টি দেশের স্বীকৃতি অর্জন												

[২৬] এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর নিজ বয়ান এরকম "১৯৩৮ সালের ঘটনা। শেরে বাংলা তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং সোহরাওয়ার্দী তখন শ্রমমন্ত্রী। তারা গোপালগঞ্জ আসবেন।...স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করার ভার পড়লো আমার উপর।...১৯৩৯ সালে কলকাতা যাই বেড়াতে। শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করি।...শহীদ সাহেবকে বললাম, গোপালগঞ্জে মুসলীম ছাত্রলীগ গঠন করবো এবং মুসলীম লীগও গঠন করবো। খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেব এমএলএ তখন মুসলীম লীগে যোগদান করেছেন। তিনি সভাপতি হলেন ছাত্রলীগের। আমি হলাম সম্পাদক। মুসলীম লীগ গঠন হল। একজন মোক্তার সাহেব সেক্রেটারী হলেন, অবশ্য আমিই কাজ করতাম। মুসলীম লীগ ডিফেন্স কমিটি একটা গঠন করা হল। আমাকে তার সেক্রেটারী করা হল। আমি আস্তে আস্তে রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করলাম" (দেখুন, শেখ মুজিবুর রহমান (২০১২), অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ: ১০-১১, ১৩-১৪; ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)

উৎসঃ লেখক কর্তৃক বিনির্মিত।

'৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতির মান-পরিমাণসহ সংশ্লিষ্ট প্রভাব-অভিঘাত সম্পর্কে তৃতীয় অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছি। আগেই বলেছি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ অর্থনীতি ও সমাজের গঠন-পুনঃগঠন, নির্মাণ-পুনঃনির্মাণ, পুনর্বাসন ও পরবর্তীকালীন উন্নয়ন নিয়ে বিদেশি-দেশি পণ্ডিতেরা যখন যথেষ্ট সংশয়-সন্দেহ প্রকাশ করেছে তারই মধ্যে বঙ্গবন্ধু তারই উদ্ভাবিত দু'ধরনের বৃহৎ বর্গের বাস্তব-প্রায়োগিক কর্মকাণ্ড করেছেন। যার প্রথমটি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি (যার সার সংক্ষেপ ছক ১-এ দেখানো হয়েছে)। বৃহৎ বর্গের দ্বিতীয় ধরনের কর্মকাণ্ডটি ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোর পুনঃনির্মাণ-নির্মাণ, পুনঃগঠন-গঠনের মাধ্যমে শূন্য থেকে শুরু করে ক্ষুধামুক্ত, শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন এক অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করা, সোনার বাংলা গড়ে তোলা। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ১৩১৪ দিনে যেসব বিষয়ে অগ্রাধিকার (priority) দিলেন এবং সঠিক ধাপে ধাপে কাল-অনুক্রমিক (sequencing) এগুলেন এ সম্পর্কে স্বল্পজ্ঞান অথবা জ্ঞানের অভাব থাকলে "বেঁচে থাকলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজকে কোথায় নিয়ে যেতেন" তা নিরূপণ অসম্ভব। মাত্র ১৩১৪ দিন সময়ে তিনি যা করলেন তার সংক্ষেপ বর্ণনা-বিশ্লেষণ নিম্নরূপঃ

ক) মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী ১ কোটি শরণার্থীসহ দেশের অভ্যন্তরে উদ্বাস্তু লক্ষ-লক্ষ বাস্তুচ্যুত-গ্রামচ্যুত-শহরচ্যুত পরিবারের পুনর্বাসন, দেশের অভ্যন্তরে ৪৩ লক্ষ বিধ্বস্ত বাসগৃহ পুনর্বাসনসহ এসব পরিবারে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সরবরাহের কাজটি ছিল বড় মাপের চ্যালেঞ্জ। এ সমস্যা সমাধানে অন্যতম প্রধান বাধা ছিল পাকিস্তানপন্থী স্থানীয় পরিষদ ও প্রশাসন। সমাধানে বঙ্গবন্ধুর সরকার রেডক্রস সোসাইটিকে

জাতীয় পর্যায় থেকে নিম্নতর স্তর পর্যন্ত পুনর্গঠিত করে। একই সাথে জেলা পর্যায় পর্যন্ত ত্রাণ কমিটি গঠনের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয় (৯ জানুয়ারি ১৯৭২) এবং গ্রামের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৫-১০ সদস্যের "ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি" গঠন করা হয়। এসব ত্রাণ কমিটিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে পরীক্ষিত রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর যেহেতু ঐ সময় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা পাকিস্তান আমলে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেহেতু দেশে সব স্থানীয় পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় (১ জানুয়ারি ১৯৭২)। ফলে উল্লিখিত ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটিগুলোর শক্তি ও ক্ষমতা বেড়ে যায়। ১৯৭৩ এর ৪ মার্চ সরকার তথ্য দেন যে ঐ সময় নাগাদ সরকার মোট ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে সামগ্রিক পুনর্বাসনসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত ৯ লক্ষ ঘরবাড়ি পুনঃনির্মাণ করেছেন। অর্থাৎ জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের প্রতিভূ মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মী একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক বঙ্গবন্ধু প্রথমেই যে কাজটিতে হাত দিলেন তাহলো যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের পুনর্বাসন।

খ) কৃষিই ছিলো বাংলার প্রাণ। কৃষিকে পাকবাহিনী ও তাদের দালাল-দোসররা সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দিয়েছিলো (কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা ও অভিঘাত সম্পর্কে ইতোমধ্যে তৃতীয় অনুচ্ছেদে বিশ্লেষণ করেছি)। কৃষির চিরাচরিত কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের কথা বঙ্গবন্ধু গুরুত্ব দিয়েই ভেবেছিলেন; কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষিতে বিদ্যমান শ্রেণি কাঠামো জিইয়ে রেখে মুক্তিও আসবে না জনকল্যাণকামী উন্নয়নও হবে না। কিন্তু এসব কাজে হাত দেবারা আগে যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত কৃষি-খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে বঙ্গবন্ধু যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন তার মধ্যে অন্যতম হলো: কৃষকদের জরুরিভিত্তিতে কৃষি ঋণ প্রদান ও বীজ সরবরাহ করা; গভীর ও অগভীর নলকূপ মেরামত ও পুনঃখনন করা; হাল চাষের জন্য কয়েক লাখ গরু আমদানি করে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা; ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা; এক ফসলি জমিকে দুই ফসলি জমিতে রূপান্তরের সবার্ত্মক প্রয়াস; খাসজমি ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকসহ বাস্তুহারাদের মধ্যে বণ্টন; চর এলাকায় বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ; উপকূল অঞ্চলের মানুষদের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক বান থেকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।[২৭] এসব ছাড়াও কৃষিতে শ্রেণি বৈষম্য হ্রাসে কৃষকদের মুক্তিসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু যেসব পদক্ষেপ নেন এবং ঘোষণা করেন তার মধ্যে ছিল ১০০ বিঘার বেশি জমির মালিকদের জমি খাস হিসেবে ঘোষণা; খাস জমি ও নতুন চর বিনামূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন; ঋণে জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির জন্য খায়-খালাসী আইন পাশ; বন্ধকী ও চুক্তি কবলা জমি ৭ বছর ভোগ করা হলে তা মালিককে ফেরত প্রদান যাতে জোতদারদের কাছ থেকে কৃষক জমি ফেরত পায়।[২৮] এসবই স্পষ্ট প্রমাণ করে সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা যার ভিত্তি-দর্শন ছিলো সমাজতন্ত্রসহ গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ়মূল বিশ্বাস।

গ) ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যখন স্বদেশের মাটিতে পা রাখলেন সে সময় দেশে মোট খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ টন। সরকারের হাতে খাদ্যশস্যের মজুদ ছিল মাত্র ৪ লক্ষ টন। খাদ্য পরিস্থিতি এমনিতেই ছিল সংকটময় আর সংকট গুণিতক হারে বাড়লো কারণ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের (যার বর্ণনা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে তৃতীয় অনুচ্ছেদে) একদিকে আমাদেরই আধাভুক্ত-অভুক্ত মানুষকে খাওয়ানোর পাশাপাশি খাদ্য সরবরাহ করতে হবে ৯০ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি ও আটককৃত ৫০-৬০ হাজার দালাল-রাজাকারদের (যারা খাদ্য ঘাটতির মূল কারণ) এবং সেইসাথে প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। খাদ্য ঘাটতি আর অতি নগন্য মজুত নিয়ে এ সমস্যারও সমাধান করলেন বঙ্গবন্ধু সরকার। এ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রাথমিক পর্যায়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার এক বিরল যোগ্যতার প্রমাণ।

ঘ) অপূরণীয়-অপরিমেয় মানবসম্পদ ক্ষতির পাশাপাশি পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী ও তাদের এ দেশিয় দালালরা সবচে' বেশি ক্ষতি সাধন করেছে অবকাঠামোগত-ভৌত সম্পদের যার মধ্যে অন্যতম রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বিদ্যুৎ (উৎপাদন-সঞ্চালন-বিতরণ), টেলিযোগাযোগ। অবকাঠামো ধ্বংস বিষয়টি যে শুধুমাত্র পরিমাণের নিরিখে বিশাল ক্ষতি ছিল তাইই নয় তা ভবিষ্যত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনে কৌশলগত দিক থেকেও ছিল অপূরণীয়। যেহেতু যে কোনো দেশেরই 'অবকাঠামো'– উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত সেহেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামোর সংস্কার, নির্মাণ, পুনঃনির্মাণের কাজটিকে প্রথম থেকেই অগ্রাধিকার বিষয় হিসেবে গণ্য করা হলো। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি

[২৭] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, নুহ-উল-আলম লেনিন কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত "ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু" গ্রন্থে (প্রকাশকাল আগস্ট ২০১১) এইচটি ইমাম রচিত প্রবন্ধ "স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু" (পৃ. ১১১) এবং একই গ্রন্থে ড. মো. মাহবুবুর রহমান রচিত "বঙ্গবন্ধুর শাসনামল, ১৯৭২-৭৫" (পৃ: ১৫১) প্রবন্ধে। প্রবন্ধদ্বয়ে মুক্তিযুদ্ধোত্তর ১৯৭২-৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার আরো যা করেছিলো সেসবের বর্ণনা করা হয়েছে।

[২৮] বিস্তারিত দেখুন, সিরাজ উদদীন আহমেদ (২০১১), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পৃ: ৬৬৪, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

১৯৭২ সালে স্বদেশে ফিরে ১২ জানুয়ারি ১২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠনের পরেই কোনো বিলম্ব না করে ১৯৭২-এর জানুয়ারি মাসেই ধ্বংসপ্রাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সংস্কার-নির্মাণ-পুনঃনির্মাণ-পুনঃগঠনে অগ্রাধিকারভিত্তিতে হাত দেন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্কার কাজে হাত দেন মার্চ মাসে (দেখুন খেরোখাতা, ছক ১)। বিধ্বস্ত রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্টসমূহ ১৯৭৩এর শেষ নাগাদ চলাচল উপযোগী করা হয়; একই সময় রেল লাইনগুলো চলাচল উপযোগী করা হয়; চট্টগ্রাম বন্দর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় ১৯৭৪ নাগাদ মাইনমুক্ত করা হয়; টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সচল করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা শহরের জন্য আনুমানিক ৫ হাজার টেলিফোন সেট, ৩১টি ট্রাঙ্ক লাইন নতুন স্থাপন, এক্সচেঞ্জের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি, ২ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ টেলিফোন তার আমদানিসহ কমপক্ষে ১ হাজার দক্ষ টেলিফোন কর্মী গড়ে তোলা হয়। অর্থাৎ অতি স্বল্প সময়েই বিচক্ষণ ও প্রায়োগিক দক্ষতাসহ অর্থনীতির অবকাঠামোর বিকল অবস্থা কার্যকরভাবে সচল করা হয়। অথচ পশ্চিমা পণ্ডিতেরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন "বাংলাদেশ গড়ে তোলা অসম্ভব", "বাংলাদেশ সচল করতে কমপক্ষে দশ বছর সময় লাগবে"।

ঙ) মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতিসহ শিক্ষা কার্যক্রম যে প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছিলো এ বিষয়টির বর্ণনা-বিশ্লেষণ ইতোমধ্যে করা হয়েছে (প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে)। সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর সরকার অগ্রাধিকার ক্রমানুযায়ী যে কাজগুলি করলেন তা হলো ১৯৭১-এর মার্চ-ডিসেম্বরকালীন ছাত্র বেতন মওকুফ এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে স্বাধীন-মুক্ত-জ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষ সৃষ্টির জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ঘোষণা (উভয়ই ১৯৭২ এর ফেব্রুয়ারি মাসে); ধ্বংসপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণসামগ্রি সরবরাহ (অব্যাহত এ কাজের শুরু ১৯৭২-এর মার্চ মাসে); প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ (১৯৭২এর এপ্রিল মাসে শুরু); বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান (১৯৭২এর জুন মাসে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় বাজেটে); এবং ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন ও শিক্ষকদের ৯ মাসের মধ্যে বেতন প্রদান (উভয়ই ১৯৭২-এর জুলাই মাসে)। এসবের বেশ কয়েকটি কর্মকাণ্ড চলমান থাকলো। এ তো গেল ১৯৭২ সালের কথা। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যেই দেশে দ্রুত নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং গণশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ৩৬ হাজার ১৬৫টি বেসরকারি স্কুল সরকারীকরণ-জাতীয়করণ এবং ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করলেন। ফলে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৪২ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকৃত হলো।

স্বাধীনতাত্তোরকালে বঙ্গবন্ধু যে বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষাকে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বয়নে ও জাতি-রাষ্ট্র বিনির্মাণে অন্যতম প্রধান মৌলিক উপাদান হিসেবে দেখবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক। বিজ্ঞানভিত্তিক-গণমুখী-কর্মমুখী-জীবনমুখী শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট মাত্রায় গুরুত্বপ্রদান– এটা বঙ্গবন্ধুর দেশজ উন্নয়ন দর্শনের (home grown development philosophy) অন্যতম প্রধান অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষাকে বঙ্গবন্ধু কখনও ব্যয় (expenditure) হিসেবে গণ্য করেননি, গণ্য করেছেন উন্নয়নে সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ (investment) হিসেবে।[২৯] আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্পষ্ট ধারণা প্রসঙ্গে যা বললাম তার স্বপক্ষে উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার-টেলিভিশনে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণের একাংশের শিরোনাম ছিলো "শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ"। ১৯৭০-এর ঐ ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেন "সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লক্ষেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটা 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণির জন্য খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিক্যাল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের

[২৯] যদিও আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতার ৪৩ বছর পরেও অনেক নীতিনির্ধারক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ এখনও শিক্ষাকে ব্যয় বলেই মনে করেন। বঙ্গবন্ধু "বেঁচে থাকলে" এতদিনে হয়তো বা তাদের ভ্রান্ত এ ধারণার অবসান হতো।

অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে"।[৩০] শিক্ষা যে মানুষের মৌলিক অধিকার, শিক্ষা যে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ আর তাই শিক্ষাখাতে যথেষ্ট মাত্রায় বিনিয়োগ করতে হবে, শিক্ষাকে যে হতে হবে বিজ্ঞানসম্মত, শিক্ষক বিশেষ করে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের যেন উচ্চ মর্যাদায় দেখা হয়, দারিদ্র্য যেন শিক্ষার মাধ্যমে মেধা বিকাশে বাধা না হয়– বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনার এসবের কোনোটিই রাজনৈতিক স্লোগানমাত্র ছিল না। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণীত ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, বাংলাদেশের সংবিধান, মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন (১৯৭৩ সাল), সেই সাথে প্রথম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনাসহ প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয়করণ।

বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত শিক্ষাভাবনার শ্রেষ্ঠ প্রতিফলনই ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (যা সরকারের কাছে পেশ করা হয় ১৯৭৪ সালের ৩০ মে)। এ কমিশন দেড় বছর কঠোর পরিশ্রম আর বিভিন্ন জরিপ-পর্যালোচনার ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মুক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য প্রগতিশীল শিক্ষাসংস্কারের একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা প্রণয়ন করে। ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবনা ও সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

(১) জনগণকে জাতীয় কর্মে ও উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকা রাখার যোগ্য করে তোলার জন্য একটি সর্বজনীন শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে,

(২) পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে দ্রুত প্রসার ঘটেছে তাতে সুনাগরিকত্ব অর্জনের জন্য অন্তত আট বছরের বুনিয়াদি শিক্ষা প্রয়োজন। এ কারণে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে গণ্য করে তাকে সর্বজনীন করতে হবে,

(৩) অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে,

(৪) প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে অবৈতনিক শিক্ষা চালু আছে তা ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এক অভিন্ন ধরনের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে,

(৫) প্রয়োজনে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের জন্য নৈশস্কুল চালু করতে হবে,

(৬) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সূচিকে জনগণের জীবনধারণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও জীবনমুখী করতে হবে,

(৭) নবম শ্রেণি থেকে শিক্ষাক্রম মূলত দু'ভাগে বিভক্ত হবে: বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা; বৃত্তিমূলক ধারায় মাধ্যমিক শিক্ষা হবে তিন বছরের আর সাধারণ ধারায় হবে চার বছরের,

(৮) মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংস্কার করতে হবে।

সুতরাং সুস্পষ্ট প্রতিয়মান যে, ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব ও সুপারিশসমূহসহ যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল তার ভিত্তি-দর্শন হলো বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের চার মূলনীতি– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ।

চ) ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর এ দর্শনের মর্মবস্তু অনুধাবনে বিষয়টির প্রাক-ইতিহাস স্মরণ করা জরুরি। আর তা হলো নিম্নরূপ: ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের[৩১] ২১ দফা কর্মসূচিতে জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো, তবে তখনকার সময়ের বিবেচনায়

---

[৩০] বঙ্গবন্ধুর ১৯৭০-এর নির্বাচনী ভাষণটির জন্য দেখুন: মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত), বঙ্গবন্ধুর ভাষণ (১৯৮৯), ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন, পৃ: ৩০।

[৩১] ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টসহ ১৯৫৫ সাল বাঙালি জাতির ইতিহাসে বিশেষ সময় বিধায় সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন। বিষয়সমূহ নিম্নরূপ: (১) ১৯৫৪ সালে ১০ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন, যে নির্বাচনে ৩০৯ আসন বিশিষ্ট প্রাদেশিক পরিষদে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৮টি আসনে বিজয়ী হয়। এর মধ্যে ১৪৩টি আসনে বিজয়ী আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল। মুসলিম লীগ সরকারের একজন মন্ত্রীও ঐ নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেননি; (২) যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী অভিযানে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি জনসমক্ষে প্রচারে নেতৃত্ব দেন। এই একুশ দফা কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য দুটি দফা ছিল "বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করা হইবে" এবং "লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয়ক ক্ষমতা পূর্ব বঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে" (দেখুন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড– সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৮২, পৃ-৩৭৩-৩৭৪); (৩) ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রিত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয় যেখানে সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান (তখন তার বয়স ৩৪ বছর)। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপন করে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ৯২ক ধারা বলে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকারকে বরখাস্ত পূর্বক জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেয়। বঙ্গবন্ধুসহ যুক্তফ্রন্টের ১৬ শত নেতা-কর্মী-সমর্থককে

তা ছিল শুধু পাট শিল্পের জন্য; আর ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে ছাত্রদের ১১ দফা দাবির ৫নং দাবি ছিল পাট, বস্ত্র, চিনিকল ও ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের জাতীয়করণ করতে হবে। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনি ইস্তেহারে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেন শোষণমুক্ত সমাজ তথা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বিনির্মাণের এ লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭২ সালের ২৮ মার্চে তিনি জাতীয়করণ নীতি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে ব্যাংক (বিদেশি ছাড়া), বীমা (বিদেশি ছাড়া), পাট, বস্ত্র, কাগজ শিল্প, অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পরিবহন, বৃহৎ পরিত্যক্ত প্রতিষ্ঠান (১৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে), বিমান ও জাহাজ কর্পোরেশনকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।[৩২] এছাড়াও সামন্তবাদ উচ্ছেদের লক্ষ্যে জমির মালিকানার সর্বোচ্চসীমা ১০০ বিঘা বেঁধে দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ) আদেশের আওতায় সমস্ত শাখাসহ ১২টি ব্যাংকের দখলিস্বত্ত সরকার গ্রহণ করে সেগুলোর সমন্বয়ে মোট ৬টি ব্যাংক গঠিত হয়।[৩৩] ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৩ জানুয়ারি ১৯৭২-এ জারিকৃত ১ নং আদেশ (AOP 1) এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ ঘোষিত ১৬ নং আদেশ (PO 16) এর আওতায় অবাঙালি তথা পাকিস্তানি মালিকানার ৮৫ শতাংশ শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিত্যক্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নবগঠিত রাষ্ট্র এসবের মালিকানা ও দখল গ্রহণ করে। এসব পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহ জাতীয়করণ আইনের মাধ্যমে 'রাষ্ট্রায়ত্ত খাত' হিসেবে অভিহিত হয়। উল্লেখ্য যে, পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশের PO 16 বিধি অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা ফেরত পাবার জন্য সরকার বরাবর আবেদনের সুযোগ দেয়া হয়েছিলো। তবে এ আদেশে জাতীয়করণকৃত সম্পত্তি ফেরত পাবার কোনো সুযোগ ছিল না। জাতীয়করণ আইন প্রয়োগ করে ৬৭টি পাটকল, ৬৪টি বস্ত্রকল এবং ১৫টি চিনিকল জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয়করণ করা হয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের ৫৩টি বৃহৎ শিল্প (যার মূল্যমান জাতীয়করণকৃত মোট পরিসম্পদের ৪৮ শতাংশ), পরিত্যক্ত ঘোষিত মোট ৪১১টি শিল্প-কারখানা যার মধ্যে ১১টি বৃহৎ শিল্প ইউনিট এবং ৪০০টি ক্ষুদ্র শিল্প (যার মূল্যমান জাতীয়করণকৃত মোট পরিসম্পদের ২৯ শতাংশ), এবং বাঙালি উদ্যোক্তাদের আংশিক মালিকানা ছিল এমন ৭৫টি নতুনভাবে জাতীয়করণকৃত পাট ও বস্ত্র কারখানা (যার মূল্যমান জাতীয়করণকৃত মোট পরিসম্পদের ২৩ শতাংশ)। এছাড়াও পূর্বের সরকারি মালিকানাধীন জাতীয় বিমান সংস্থা ও জাতীয় শিপিং সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এভাবে ১৯৭২ সালের মূল্যমানে ১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্থায়ী পরিসম্পদ জাতীয়করণ করা হয় (যার অন্তর্ভুক্ত পরিত্যক্ত ও অনুপস্থিত মালিকদের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান)। উল্লেখ করা উচিত যে, যেহেতু জাতীয়করণকৃত সম্পদের পূবর্তন মালিকরা প্রায় সকলেই ছিলো অবাঙালি সেহেতু বাঙালিদের দিক থেকে তেমন কোনো বিরোধিতা ছিল না। তবে প্রাক-অভিজ্ঞতার অভাব, জাতীয়করণকৃত কল-কারখানা পরিচালনে ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক নেতাদের ব্যর্থতা, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর দুর্বল অবস্থা– এসব কারণে বলা যায় জাতীয়করণের মত সংস্কার কার্যক্রম ফলপ্রদভাবে বাস্তবায়ন উপযোগী রাজনৈতিক অঙ্গিকারসমৃদ্ধ শাসন-প্রশাসনযন্ত্র সরকারের ছিলো না।[৩৪] তবে একথা আদৌ সত্য নয় যে বঙ্গবন্ধুর সরকার তার জাতীয়করণ নীতির কার্যকর বাস্তবায়নে চেষ্টা করেননি। বরঞ্চ উল্টোটা সত্য। বঙ্গবন্ধু সরকার জাতীয়করণকৃত মিল-কল-কারখানা-ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠান দক্ষতার সাথে পরিচালনের লক্ষ্যে একদিকে যেমন বিদেশ থেকে (বিশেষত রাশিয়াসহ সমাজতান্ত্রিক বিভিন্ন দেশ এবং প্রতিবেশী ভারত) সংশ্লিষ্ট বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ-ব্যবস্থাপক এনেছিলেন, অন্যদিকে আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক এমনকি শ্রমিক নেতাদের জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান পরিচালনে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ ব্যাপারটি ছিলো সময়ের (time factor)– যে সময়টি পাবার আগেই

গ্রেফতার করা হয় আর প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে নিজগৃহে অন্তরীণ রাখা হয়। মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী দেশের বাইরে ছিলেন; মওলানা ভাসানীকে গুলি করে হত্যার হুমকি দিলেন জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা; (৪) জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার গভর্নর-শাসন স্বল্পস্থায়ী ছিল; ১৯৫৫ সালের ১০ জুলাই চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে যে মন্ত্রীসভা গঠন করেন ঐ মন্ত্রীসভায় দেশদ্রোহী শেরে বাংলা খ্যাত এ কে ফজলুল হক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হন (একেই বলে রাজনীতি! একেই বলে রাজনীতিতে পালটি খেলা! একেই বলে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই!); (৫) ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী পাকিস্তানের অন্যতম প্রদেশ পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন পূর্ব পাকিস্তান; (৬) ১৯৫৫ সালে জুলাই-আগস্ট মাস থেকে শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলেন; আওয়ামী লীগ 'কেন পূর্ব বঙ্গের অটোনমি চায়' শীর্ষক একটি পুস্তিকার খসড়া প্রণয়ন করেন শেখ মুজিব স্বয়ং যা প্রকাশিত হয়; (৭) ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের গণপরিষদে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষাসহ জনসংখ্যার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি উত্থাপন করেন; (৮) ১৯৫৫ সালের ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মাধ্যমে 'মুসলিম' শব্দটি তুলে দিয়ে সংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক এবং সংগঠনের নামকরণ 'আওয়ামী লীগ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই সম্মেলনে নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের সভাপতি হন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদন হন শেখ মুজিবুর রহমান।

[৩২] মযহারুল ইসলাম, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব", পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ: ৮১২।

[৩৩] বিস্তরিত দেখুন, নূহ-উল-আলম লেনিন কর্তৃক সম্পাদিত ২০১১ আগস্টে প্রকাশিত "ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু" গ্রন্থে ড. মো. মাহবুবুর রহমান রচিত "বঙ্গবন্ধুর শাসনামল, ১৯৭৫-৭৫", পৃ: ২৬৩-২৬৪।

[৩৪] বিস্তারিত দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৪।

একদিকে মিল-কল-কারখানা পরিকল্পিতভাবেই অস্থিতিশীল করে ফেলা হলো আর অন্যদিকে দেশটাকে টেনে এমন জায়গায় ঠেলে দেয়া হলো যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যে দিয়ে একটা জাতির স্বপ্ন হত্যা হয়ে গেলো। আর দুঃখজনক হলো এই যে, পিতা হত্যার কার্যকারণ বুঝতে আমাদের সময় লাগলো ২০-২৫ বছর। সাম্রাজ্যবাদ-প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ভয়াবহ এ সম্মিলিত-খেলা চলমান!

ছ) বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন ছিলো এ দেশের গণমানুষের সুখ-সমৃদ্ধি (well-being অর্থে) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন (deeprooted humane philosophy aiming at ensuring people's well-being)। আগেই বলেছি, এ দর্শনের ভিত্তিমূলে ছিলো এক ঐতিহাসিক বিশ্বাস যে "কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে"। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দর্শনানুযায়ী গণমানুষের মুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে জন্ম হলো "গণপ্রজাতন্ত্রী" বাংলাদেশ যেখানে সাংবিধানিকভাবেই "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭)। এ দর্শনের স্পষ্ট প্রতিফলন হল তাঁর স্বপ্নঃ "সোনার বাংলার স্বপ্ন", "দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন", "শোষণ-বঞ্চনা-দুর্দশামুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন"। বঙ্গবন্ধু গড়তে চেয়েছিলেন "সুস্থ-সবল-জ্ঞানসমৃদ্ধ-ভেদ-বৈষম্যহীন মানুষের উন্নত বাংলাদেশ"। বঙ্গবন্ধু তারই উদ্ভাবিত ঐ উন্নয়ন দর্শন বাস্তবে রূপ দিতে অন্যতম মৌল-উপাদান হিসেবে সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তি পুরোমাত্রায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।[৩৫] আর সে কারণেই মালিকানার নীতি বিষয়ে সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হলো গুরুত্বক্রম অনুসারে রাষ্ট্রে মালিকানা ব্যবস্থা হবেঃ প্রথমত– রাষ্ট্রিয় মালিকানা; দ্বিতীয়ত– সমবায়ী মালিকানা, এবং তৃতীয়ত– (নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে) ব্যক্তিগত মালিকানা। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন গ্রামীণ সমাজে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দেশের প্রতিটি গ্রামে গণমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হবে যেখানে গরীব মানুষ যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিক হবেন; যেখানে সমবায়ের সংহত শক্তি গরীব মানুষকে জোতদার-ধনী কৃষকের শোষণ থেকে মুক্তি দেবে; যেখানে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা গরীবের শ্রমের ফসল আর লুট করতে পারবে না; যেখানে শোষণ ও কোটারি স্বার্থ চিরতরে উচ্ছেদ হয়ে যাবে। মানুষের যৌথ উদ্যোগ-যৌথ চিন্তার প্রতিষ্ঠান সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর এ স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারি চিন্তাসমৃদ্ধ ছিল তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যে যেখানে তিনি বলছেন "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে– এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুসম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ।...আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার। ...অতীতের সমবায় ছিল শোষক গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারী স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন– কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন সমবায় সংস্থাগুলিকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি ঘোষণা করছি যে সংস্থার পরিচালনা দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির উপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলি যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতী সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতী, কৃষকের সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে।...আমার

[৩৫] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০০৯, "বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন", বাংলাদেশ সরকারের সমবায় অধিদপ্তর আয়োজিত ৩৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে রচিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকাঃ ০৭ নভেম্বর ২০০৯।

প্রিয় কৃষক, মজুর, জেলে, তাঁতী ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন ও সুসম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারি স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে"। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, গরীব মানুষকে জোতদার-ধনীদের শোষণ থেকে মুক্তি, মেহনতী মানুষের যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসসহ সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ ও গণতন্ত্র বিকশিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাতভিত্তিক, পেশাভিত্তিক গণমুখী সমবায় আন্দোলন (pro-people co-operative movement) গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় বিষয়াদি বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত বক্তব্যে স্ব-ব্যাখ্যায়িত।

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উদ্ভাবিত ১৯৭২ সালে ঘোষিত গণমুখী সমবায় আন্দোলন সফল হয়নি। একদিকে বৃহৎ ভূ-স্বামী জোতদারদের (যাদের একাংশ ছিল পাক হানাদার বাহিনীর দালাল) জমি হারানোর ভীতিসহ বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্র (যার অন্যতম কারণ বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রি ছিলেন বিধায় বলেছিলেন "সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ") আর অন্যদিকে বিভিন্ন খাত-ক্ষেত্র-পেশাভিত্তিক বহুমুখী সমবায় গঠন ও পরিচালন কিভাবে হবে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব– এসবই গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়নি। সেই সাথে এ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যতটুকু সময় পাওয়া প্রয়োজন ছিল তাও পাওয়া যায় নি। মনে রাখা উচিত যে, কৃষি প্রধান জনবহুল বাংলাদেশে জমি-জলা-বনভূমি শুধুমাত্র দুষ্প্রাপ্য সম্পদই নয় তা ছিলো (এখনও আছে) সমাজে ব্যক্তির শ্রেণিগত-অর্থনৈতিক-সামাজিক শক্তি ও অবস্থানের মূল ভিত্তি। বিষয়টি এরকম জমি যার শক্তি তার, যার যত বেশি জমি সে ততবেশি শক্তিধর। যে কারণেই শ্রেণিবিভক্ত কৃষিভিত্তিক সমাজে ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪ সালে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের কার্যক্রম এগোয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। বঙ্গবন্ধু এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। বঙ্গবন্ধু তারপরও দমে যাননি। ১৯৭৫ সালে ২৬ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানের (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু বললেন; "...এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব, তা নয়। পাঁচ বছরের প্লান-এ বাংলাদেশে ৬৫ হাজার গ্রাম-কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদের বিদায় দেয়া হবে তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারী কো-অপারেটিভ হবে।... আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে। ... আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুল প্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে।[৩৬] এখানে উল্লেখ জরুরি যে, বাধ্যতামূলক গ্রাম সমবায়সহ বহুমুখী সমবায় গঠন নিয়ে বঙ্গবন্ধু যেদিন দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিতে এসব ঘোষণা দিলেন তার সাড়ে ৪ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো।

জ) স্বাধীনতাত্তোর ১৩১৪ দিনে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলায়' রূপান্তর ও 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর' লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র পুনর্বাসন, পুনঃগঠন, পুনঃনির্মাণ কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) মাত্র আড়াই মাসের মধ্যেই (৩০ মার্চ ১৯৭২) দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, যার চেয়ারম্যান ছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজে।[৩৭] কমিশন দিন-রাত পরিশ্রমসহ সংশ্লিষ্ট অনেক গবেষণা, জরিপ ও বিচার-বিশ্লেষণ করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বিনির্মাণের জন্য মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে রচনা করলেন এক ধ্রুপদী দলিল– বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮), যার বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে। ধ্রুপদী এ দলিলের ভিত্তি দর্শন হিসেবে কাজ করেছে গণতন্ত্র-জাতীয়তাবাদ-ধর্মনিরপেক্ষতা-সমাজতন্ত্র সংশ্লিষ্ট বঙ্গবন্ধুর "স্বদেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শন"– ধার করা কোনো উন্নয়ন দর্শন নয়। উন্নয়নের এই ধ্রুপদী প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলটি রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ দলিল ১৯৭২-এর 'সংবিধান'কে পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত করে।

---

[৩৬] বিস্তারিত দেখুন, মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত), ১৯৮৮, "বঙ্গবন্ধুর ভাষণ", পৃ: ২১৪-২১৮, ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন্স।

[৩৭] বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনে একত্রিত করা হলো দেশের স্বনামখ্যাত দেশপ্রেমিক অর্থনীতিবিদদের। মন্ত্রী পদমর্যাদায় ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হলো ড. নুরুল ইসলামকে আর প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হলো অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান এবং অধ্যাপক ড. মুশাররফ হোসেনকে।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) দেশ-জাতি-রাষ্ট্র গঠনে বঙ্গবন্ধুর প্রায়োগিক চিন্তা-ভাবনার দ্বিধাহীন, দ্ব্যর্থতাহীন, সুস্পষ্ট যৌক্তিক পথ নির্দেশনাসমূহ বিশ্লেষণ করলে "বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ আজ কোথায় দাঁড়াতো"– এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরের অনেক কিছুই অনুমান করা সম্ভব। উল্লেখ্য যে, সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ -আলোকিত-বৈষম্যহীন-ভেদহীন-অসাম্প্রদায়িক মানুষ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাই ছিল স্বাধীনতার মর্মবস্তু, যে আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখেই এদেশের জনগণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী দেশ গঠনে স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছিলো। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলকে বঙ্গবন্ধু সৃষ্ট এ গণআকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অভিহিত করা যুক্তিসঙ্গত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন বিষয়টি সঙ্গত কারণেই গুরুত্ব পেলেও মূল দিক নির্দেশনার বিষয় ছিল ভবিষ্যতের বাংলাদেশ– বৈষম্যহীন, জনকল্যাণকর, আলোকিত, সমৃদ্ধ, উন্নত, প্রগতিবাদী এক বাংলাদেশ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহে যা বলা হয়েছিল তা স্পষ্ট এসব নির্দেশ করে। বলা হয়েছিল:

১. পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে দারিদ্র্য হ্রাস। আর লক্ষ্যার্জনের কৌশল হিসেবে বলা হয়েছিল: কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, এবং সমতা-ভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য কার্যকরী আর্থিক ও দ্রব্যমূল্য-সংশ্লিষ্ট নীতিমালা।

২. অর্থনীতির প্রতিটি খাতে বিশেষত কৃষি ও শিল্পের পুনঃগঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি।

৩. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ থেকে ৫.৫ শতাংশে উন্নিত করা। আর আনুষ্ঠানিক খাতসমূহে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নয়নে স্বেচ্ছাশ্রমের বিকাশ। মানব শক্তি ও অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোচ্চ বিকাশের লক্ষ্যে উন্নয়নমুখী স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করা।

৪. নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের (বিশেষ করে খাদ্য, বস্ত্র, ভোজ্যতেল, কেরোসিন, চিনি) উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এসবের বাজার মূল্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতের নাগালে রাখা এবং স্থিতিশীল করা (কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে)।

৫. বণ্টন নীতিমালা (পুনঃবণ্টনমূলক আর্থিক নীতিকৌশল) এমন রাখা যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির হার গড় আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশী হয় (এবং উচ্চ আয়ের মানুষদের এক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে)।

৬. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের ভূমিকা তার ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা-দক্ষতার ভিত্তিতে নিরুপণ করা; গ্রাম-শহরে স্ব-কর্মসংস্থান সুযোগ বৃদ্ধি করা; অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জনকল্যাণকামী পরিবর্তন সাধন করা।

৭. বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা– ৬২ শতাংশ থেকে ১৯৭৭-৭৮ এর মধ্যে ২৭ শতাংশে কমিয়ে আনা। স্ব-নির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ সমাবেশ নিশ্চিত করা। বৈদেশিক মুদ্রার আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ ও বহুমুখী করা এবং আমদানি কাঠামো পুনঃবিন্যাস করা। বিশেষ করে সার, সিমেন্ট এবং স্টিলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশ নির্ভরতাভিত্তিক অনিশ্চয়তা হ্রাস করা।

৮. কৃষির প্রতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন নিশ্চিত করা; খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

৯. জনসংখ্যা বৃদ্ধিহ্রাসে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অঙ্গীকার এবং সামাজিক চেতনা বিকাশ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

১০. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ গৃহায়ন, পানি সরবরাহ ইত্যাদি খাতে উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের সাধারণ সক্ষমতা ও কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পনা দলিলের মুখবন্ধে লিখলেন "এ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভবিষ্যত বিকাশের দিক নির্দেশনা এবং উন্নয়নে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে স্বল্প সময়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। ...জাতি গঠনে আমাদের সবাইকে একাগ্র চিত্তে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে যেমনটি মুক্তিযুদ্ধে আমরা সাহস ও উদ্দীপনাসহ করেছিলাম"। আর প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নুরুল ইসলাম পরিকল্পনা দলিলের মুখবন্ধে লিখলেন "কয়েক দশকের বৈষম্য উদ্ভুত একটি দেশে মাত্র পাঁচ বছরে পুনঃগঠনের কাজ, উন্নয়নের কাজ, আর বৈষম্য দূর করার কাজ সম্পন্ন করে, দারিদ্র্য উচ্ছেদের মত আমাদের যৌথ প্রয়াসটি শুরু করা যেতে পারে মাত্র।

...সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যের কাজটির প্রস্তুতি পর্ব গুরুত্বপূর্ণ... উন্নয়ন প্রক্রিয়ার গতি হয় ধীর এবং যন্ত্রণাদায়ক। এর অর্থ ভবিষ্যত অর্জনের জন্য বর্তমানে ত্যাগ স্বীকার"।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল নিয়ে উপরে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে অন্তত দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয় বলে মনে করি। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী উন্নয়ন দর্শনটি তার উদ্দিষ্ট লক্ষ-কৌশলসহ স্বাধীনতার চেতনা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ ছিলো। দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যবস্তুও সে অনুযায়ী বিনির্মাণ করা হয়েছিলো (সব সীমাবদ্ধসহ) যেখানে মানুষে মানুষে বৈষম্য হ্রাস নিমিত্ত শক্ত-ভিত্তির জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলো। কিন্তু পাঁচ বছরের জন্য যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা[৩৮] দলিল রচিত হলো তা বাস্তবায়নের মাত্র দুই বছরের মধ্যে গভীর এক আন্তর্জাতিক-সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসহ ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ-জনকল্যাণকর-বৈষম্যহ্রাসকারী-প্রগতিবাদী বাংলাদেশের বাস্তবসম্মত স্বপ্নকে পরিকল্পিতভাবে বিনষ্টের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করা হলো– ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টে। এক্ষেত্রে আমার ধারণা হ'ল এরকম যে যদি কোনভাবে এমন কোন হিসেব করা সম্ভব হয় যেখানে "বঙ্গবন্ধুসহ আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের চেহারা কেমন হতে পারতো" এটা দেখানো যায় সে ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার গভীর ষড়যন্ত্রের কার্যকারণ সূত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকল সমীকরণও হয়তো বা উন্মোচিত হয়ে যাবে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে সে প্রয়াসটি নেয়া হয়েছে যেখানে দেখানো সম্ভব হয়েছে যে যদি বঙ্গবন্ধু 'বেচে থাকতেন' এবং সেইসাথে গণতন্ত্র-জাতীয়তাবাদ-ধর্মনিরপেক্ষতা-সমাজতন্ত্র সংশ্লিষ্ট চার-দর্শনের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবণতা বহাল থাকতো তাহলে আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের সম্ভাব্য চেহারাটি কেমন হতে পারতো? এক্ষেত্রে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কাঠামো, প্রবৃদ্ধি হার এবং বৈষম্য বিমোচনমুখী উন্নয়ন কৌশল যদি বজায় থাকতো তাহলে মোট জাতীয় আয়, মাথাপিছু জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়সহ আর্থ-সামাজিক শ্রেণি বৈষম্য হ্রাসে যে পরিবর্তন ঘটতে পারতো তা আজকের সময়ের বিচারে কল্পণাতীত এবং অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি ও সমাজ পুনর্গঠনে দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, জ্ঞান, মেধা, মনন, ধীশক্তি, সাংগঠনিক দক্ষতা সবকিছু দিয়ে বঙ্গবন্ধু সর্বাত্মক চেষ্টা করলেন। আমার ধারণা মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের ৩৩ বছরের রাজনৈতিক জীবনে তিনি জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে 'শেখ মুজিব' থেকে 'বঙ্গবন্ধু' (১৯৬৯ সালে) আর 'বঙ্গবন্ধু' থেকে 'জাতির পিতা' (১৯৭১ সালে)-য় রূপান্তরিত হতে সম্ভাব্য যত ধরনের মেধা-মনন-ধীশক্তি-শ্রম ব্যয় করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি এবং ভিন্নমাত্রার মেধা-মনন-ধীশক্তি-শ্রম ব্যয় করেছেন মুক্তিযুদ্ধের পরের মাত্র সাড়ে তিন বছরে বাংলাদেশকে সুখী-সমৃদ্ধ-শোষণমুক্ত-বৈষম্যহীন-অসাম্প্রদায়িক-সমৃদ্ধ আলোকিত এক রাষ্ট্র-সমাজ বিনির্মাণে। সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপণের দায়িত্ব জনগণের এবং নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু একথা সত্য যে একদিকে দেশের বাইরের সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আর দেশের অভ্যন্তরে ওদেরই দালাল-দোসরসহ বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠীর বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী যৌথ পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডে প্রতিবিপ্লবীদের জয় হলো ১৯৭৫ সালে (১৫ আগস্ট) বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে[৩৯] বঙ্গবন্ধু আমাদের দিয়ে গেলেন স্বাধীনতা আর আমরা পারলাম না বঙ্গবন্ধুসহ আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে– এটাই তো নির্মোহ সত্য ইতিহাস– অপ্রিয় হলেও একথাই ধ্রুব সত্য। এ বিষয়ে শেষ কথা বলা হয়তো বা কঠিন। কিন্তু অপ্রিয় সত্য হলেও এ অনুচ্ছেদ শেষ করতে চাই জীবনের শেষ জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করে। ভাষণটি ঐতিহাসিকভাবেই গুরত্বপূর্ণ এ কারণে যে ঐ ভাষণটিতে বঙ্গবন্ধু তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আর নয়া-ঔপনিবেশিক স্বৈরাচারী পাকিস্তানী শাসনামলে যে অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার-শোষণ-নির্যাতন-নিবর্তন-বঞ্চনা-বৈষম্য দেখেছেন এবং এসব কিছুর বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই-সংগ্রাম করে যে বৈচিত্রপূর্ণ জীবন-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন এবং পরবর্তীতে জীবনের শেষ পর্যায়ে জাতির পিতা হিসেবে মাত্র সাড়ে তিন বছর স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে যত বহুমুখী অনুভূতি-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন এসব কিছুর ভিত্তিতেই গভীরতম উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন;

---

[৩৮] আন্তর্জাতিক-সাম্রাজ্যবাদী এ ষড়যন্ত্রের সাথে দেশের অভ্যন্তরের যেসব ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলো আমার মতে তারা সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবাহী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি মাত্র। এদের কেউই কখনো বাংলাদেশের স্বাধীন সত্ত্বায় বিশ্বাস করেন নি; দুই মেরুর বিশ্বে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপি নির্যাতিত মানুষের পক্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে থাকুক এদের কেউই তা মনে প্রাণে চান নি; এরা সবাই মনে প্রাণে শোষণ-ভিত্তিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন; এদের অনেকেই মহান মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর দালাল-দোসর ছিলেন।

[৩৯] বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্র দেশ স্বাধীন হবার শুধু আগেই নয় তা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও অব্যাহত ছিলো– বিষয়টি বঙ্গবন্ধু ভালভাবেই জানতেন। এ মর্মে উল্লেখ জরুরি যে, ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি (বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে) স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে রমনা রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঐতিহাসিক ভাষণে তার বক্তৃতার এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বলেন "ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি।...বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই" (বিস্তারিত দেখুন, মযহারুল ইসলাম, ১৯৯৩, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব", পরিমার্জিত সংস্করণ, পৃ: ৭৭৫)। ১৯৭২ সালের ১৯ আগস্ট ঐ একই স্থানে ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তার ভাষণের একই পর্যায়ে বললেন "এই সময়ে যদি তোমরা যুবসমাজ, ছাত্র সমাজ হুশিয়ার না থাক, তবে স্বাধীনতার শত্রুরা মাথা তুলে উঠে এমন ছোবল মারবে যে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়বে। স্বাধীনতার শত্রুরা আজ সংঘবদ্ধভাবে দেশের ভিতরে বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়" (পূর্ণাঙ্গ ভাষণ দেখুন, মিজানুর রহমান মিজান সম্পাদিত, "বঙ্গবন্ধুর ভাষণ", ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন্স, তৃতীয় প্রকাশ, ২০০০, পৃ: ১২২-১৩২)।

স্বাধীনতাত্তোর সাড়ে তিন বছরের স্বাধীনতা নস্যাৎকারীদের চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন এবং দৃঢ়চিত্তে ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণটি ছিলো ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানের (এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের) জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা। উপরোল্লিখিত কারণে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের নির্বাচিত কয়েকটি মূল প্রসঙ্গ[৪০] উল্লেখ করছি (এসব প্রসঙ্গের "সূত্রায়ন" আমার নিজের):

প্রসঙ্গ ১: সরকার শুরু– রিক্ত হস্তে। বঙ্গবন্ধু বললেন "আমি যখন বাংলাদেশ সরকার পেলাম, যখন জেল থেকে বের হয়ে আসলাম, তখন আমি শুধু বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষই পেলাম। ব্যাংকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। আমাদের গোল্ড রিজার্ভ ছিল না। শুধু কাগজ নিয়ে আমরা সাড়ে সাত কোটি লোকের সরকার শুরু করলাম"।

প্রসঙ্গ ২: দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বাংলাদেশ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উত্থান ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড। বঙ্গবন্ধু বললেন "... আমি মানুষকে বললাম, আমার ভাইদের বললাম, মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের বললাম, তোমাদের অস্ত্র জমা দাও। তারা অস্ত্র জমা দিল। কিন্তু একদল লোক আমার জানা আছে যাদের পাকিস্তান অস্ত্র দিয়ে গিয়েছিল তারা অস্ত্র জমা দেয়নি। তারা এসব অস্ত্র দিয়ে নিরাপরাধ লোককে হত্যা করতে আরম্ভ করল। এমনকি পাঁচজন পার্লামেন্টের সদস্যকেও তারা হত্যা করল।...অন্ধকারে মানুষ হত্যা করতে আরম্ভ করলো।...মানুষ হত্যা থেকে আরম্ভ করে রেল লাইন ধ্বংস করে, ফারটিলাইজার ফ্যাক্টরী ধ্বংস করে, জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করলো যাতে বিদেশি এজেন্টরা যারা দেশের মধ্যে আছে তারা সুযোগ পেয়ে গেল। ...আর একদল বিদেশে সুযোগ পেল, তারা বিদেশ থেকে অর্থ এনে বাংলার মাটিতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করলো। স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করলো"।

প্রসঙ্গ ৩: বিশৃংখল-নৈরাজ্যকর অবস্থা– দেশে যেন সরকার নেই। বঙ্গবন্ধু বললেন "এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে, অফিসে যেয়ে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে যায়, সাইন করিয়ে নেয়, ফ্রি-স্টাইল। ফ্যাক্টরীতে যেয়ে কাজ না করে টাকা দাবী করে। সাইন করিয়ে নেয়। যেন দেশে সরকার নাই"।

প্রসঙ্গ ৪: দুর্নীতিবাজদের উত্থান ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের ডাক। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে দুর্নীতি নিয়ে, দুর্নীতিবাজ কারা– এ নিয়ে এবং দুর্নীতিবাজদের উৎখাত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে বললেন "...আরেকদল দুর্নীতিবাজ টাকা-টাকা, পয়সা-পয়সা করে পাগল হয়ে গেছে। ...মিথ্যা বলার অভ্যাস আমার নাই। কিন্তু কিছুটা অপ্রিয় কথা বলবো।...আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয় সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায় সে দুর্নীতিবাজ। যে হোর্ড করে সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্যপালন করে না তারা দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে।...সরকারি আইন করে কোনো দিন দুর্নীতিবাজদের দমন করা সম্ভব নয় জনগণের সমর্থন ছাড়া।...আজকে আমি বলবো বাংলার জনগণকে এক নম্বর কাজ করতে হবে, দুর্নীতিবাজদের যদি খতম করতে পারেন তাহলে বাংলাদেশের মানুষের শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ দুঃখ চলে যাবে। এতো চোরাদের চোর এই চোর যে কোথা থেকে পয়দা হয়েছে জানি না। পাকিস্তান সব নিয়ে গেছে, কিন্তু এই চোরাদের তারা নিয়ে গেলে বাঁচতাম"।

প্রসঙ্গ ৫: ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত নেই, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। বঙ্গবন্ধু এ প্রসঙ্গে বললেন "...আমার জমি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জমি। আমি কেন সে জমিতে ডবল ফসল করতে পারবো না।...আমি যদি দ্বিগুণ করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না। ভিক্ষা করতে হবে না। ভিক্ষুক জাতির কোনো ইজ্জত নেই।...আমি সেই ভিক্ষুক জাতির নেতা থাকতে চাই না।...আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে জাতি হিসেবে"।

[৪০] বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি ছিলো তাঁর অন্যান্য ভাষণের তুলনায় দীর্ঘ (মোট ১০ পৃষ্ঠার ভাষণ)। ভাষণটিতে একদিকে আছে সাড়ে তিন বছর দেশ শাসনের অভিজ্ঞতার প্রকাশ, অনুরাগ-বিরাগ, বাস্তব সত্য নিয়ে কিছু কঠোর উক্তি, আর অন্যদিকে আছে ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের দিক-নির্দেশনা। পূর্ণাঙ্গ ভাষণটির জন্য দেখুন: মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত), ২০০০, "বঙ্গবন্ধুর ভাষণ", পৃ: ২০৭-২১৮, মোতাহার হোসেন সুফী, ২০০৯, "ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক", পৃ: ৪৫৫-৪৭১, অনন্যা প্রকাশনা।

প্রসঙ্গ ৬: উন্নয়নে নতুন কর্মসূচির চার মৌল উপাদান বঙ্গবন্ধু তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের ঘোষণায় বাংলাদেশের উন্নয়নে ৪-দফা জরুরি করণীয় উল্লেখ করে বললেন "এক নম্বর হলো– দুর্নীতিবাজ খতম কর, দুই নম্বর কলকারখানায়, ক্ষেতে, খামারে প্রোডাকশন বাড়ান; তিন নম্বর হলো– পপুলেশন প্ল্যানিং; চার নম্বর হলো– জাতীয় ঐক্য। জাতীয় ঐক্য করার জন্য একদল করা হয়েছে। যারা বাংলাকে ভালবাসে, এর আদর্শে বিশ্বাস করে, চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ মানে সৎপথে চলে তারা সকলেই এই দলের সদস্য হতে পারবেন"।

প্রসঙ্গ ৭: শিক্ষিত সমাজকে তাদের মন-মানসিকতার দারিদ্র্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে চরিত্র পরিবর্তনের তাগিদসহ জনগণকে শ্রদ্ধা করতে বলা। জরুরি এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট ভাষায় বেশকিছু অপ্রিয় সত্য কথা বললেন। তিনি বললেন "শিক্ষিত সমাজকে আমি অনুরোধ করবো, আমরা কতজন শিক্ষিত লোক, আমরা শতকরা ২০ জন শিক্ষিত লোক। তার মধ্যে সত্যিকার অর্থে আমরা শতকরা পাঁচজন শিক্ষিত। শিক্ষিতদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন। আমি যে এই দুর্নীতির কথা বললাম, আমার কৃষক দুর্নীতিবাজ? না। আমার শ্রমিক? না। তাহলে ঘুষ খায় কারা? ব্লাকমার্কেটিং করে কারা? এই আমরা শতকরা ৫ জন শিক্ষিত।...শিক্ষিত সমাজকে একটা কথা বলব, আপনার চরিত্র পরিবর্তন হয় নাই। একজন কৃষক যখন আসে খালি গায়ে লুঙ্গি পরে আমরা বলব এই বেটা কোত্থেকে আইছিস? বাইরে বয়, বাইরে বয়। একজন শ্রমিক যদি আসে, বলি, এখানে দাঁড়া। এই রিকশাওয়ালা, ঐভাবে বসিস না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলে। তুচ্ছ করে। এর পরিবর্তন করতে হবে। আপনি চাকরি করেন, আপনার মাইনা দেয় গরীব কৃষক, আপনার মাইনা দেয় ঐ গরীব শ্রমিক। ...ইজ্জত করে কথা বলুন– ওরাই মালিক।...সরকারি কর্মচারীদের বলি, মনে রেখো এটা স্বাধীন দেশ। এটা বৃটিশের কলোনি নয়, পাকিস্তানের কলোনি নয়।...একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি কিছু মনে করবেন না, আমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছে কে? ...কার টাকায়? বাংলার দুঃখী জনগণের টাকায়। ...তার টাকায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, তার টাকায় ডাক্তার সাহেব, তার টাকায় অফিসার সাহেব, তার টাকায় রাজনীতিবিদ সাহেব, তার টাকায় মেম্বার সাহেব, তার টাকায় সব সাহেব। আপনি দিচ্ছেন কি? কি ফেরত দিচ্ছেন?"

প্রসঙ্গ ৮: ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থা বদলে গ্রামে গ্রাম বাধ্যতামূলক সমবায় গঠন। বঙ্গবন্ধু বললেন "সমাজব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে।... যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থাকে।...এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে।...আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদের বিদায় দেয়া হবে তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না।...পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ করা হবে"।

প্রসঙ্গ ৯: আন্তর্জাতিক বাজারে ধনীদেশের মারপ্যাচ– এই দিন থাকবে না। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু স্পষ্টভাবে শক্ত কথা বলে ফেললেন "কপাল! আমাদের কপাল! আমরা গরীব দেশ তো আমাদের কপাল! আমার পাটের দাম নেই। আমার চায়ের দাম নেই। আমরা বেচতে গেলে অল্প পয়সায় আমাদের বিক্রি করতে হয়। আমি যখন কিনে আনি– যারা বড় দেশ তারা তাদের জিনিসের দাম অনেক বাড়িয়ে দেয়। আমরা বাঁচতে পারি না। ...তোমরা অস্ত্রপ্রতিযোগিতা বন্ধ করো। ওই সম্পদ দুনিয়ার দুঃখী মানুষকে বাঁচাবার জন্য ব্যয় করো। তাহলে দুনিয়ায় শান্তি ফিরে আসবে।...তোমরা মনে করেছ আমরা গরীব, যে দামই হোক আমাকে বিক্রি করতে হবে। এইদিন থাকবে না"।

প্রসঙ্গ ১০: শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, যুবকদের প্রতি। শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বললেন "ছাত্রদের ফেল করিয়ে বাহাদুরি নিবেন তা হয় না। তাদের মানুষ করুন।...শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন, রাজনীতি একটু কম করুন।...রাগ করবেন না"। বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে বললেন "আমি বুদ্ধিজীবীদের কিছু বলি না। তাদের সম্মান করি। শুধু এইটুকু বলি যে, বুদ্ধিটা জনগণের খেদমতে ব্যবহার করুন"। যুবকদের উদ্দেশ্যে বললেন "আপনাদের ফুলপ্যান্টটা একটু

হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভ সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে। যুবক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই"।

প্রসঙ্গ ১১: ঔপনিবেশিক বিচারব্যবস্থার পরিবর্তন প্রসঙ্গে। সমসাময়িক বিচারব্যবস্থার উপর বঙ্গবন্ধু সঙ্গত কারণেই ক্ষিপ্ত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন "...বিচার। বিচার! বাংলাদেশের বিচার! ইংরেজি আমলের বিচার আল্লাহর মর্জি যদি সিভিল কোর্টে কেস পড়ে সেই মামলা শেষ হইতে লাগে প্রায় ২০ বছর।...এই বিচার বিভাগকে নতুন করে এমন করতে হবে যে থানায় ট্রাইবুনাল করার চেষ্টা করছি এবং সেখানে মানুষ এক বছর বা দেড় বছরের মধ্যে বিচার পাবে– তার বন্দোবস্ত করছি। ...দুঃখী মানুষের উপর ট্যাক্স বসিয়ে আমি আপনাদের পুষতে পারব না"।

৫। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কতদূর যেতো?

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি-সমাজ আজ কোথায় দাঁড়াতো? কতদূর পর্যন্ত যেতে পারতো বাংলাদেশ? বৈশ্বিক অর্থনীতি-সমাজে বাংলাদেশের অবস্থানটা কি হতে পারতো? এ প্রশ্নের ১০০ ভাগ সদুত্তর দেবার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ এ এক জটিল সম্ভাবতা নিরূপণ সংশ্লিষ্ট (possibilities বা probability) প্রশ্ন। এই অনুচ্ছেদে অনেক ধরনের অনেক বৈশিষ্ট্যের যুক্তিসিদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত অনুসিদ্ধান্তের[৪১] ভিত্তিতে অঙ্ক কষে এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। ঐসব অনুসিদ্ধান্তসহ আমার হিসেবপত্তর পেশ করার আগে আবারো বলে রাখা উচিত যে আজ ২০১৪ সালে বাংলাদেশের বয়স ৪৩ বছর। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরের বাংলাদেশের বয়স ৪২ বছর, আর ইতিহাসের বর্বরতম-নৃশংসতভাবে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা[৪২] পরবর্তী 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের বয়স ৩৯ বছর। উল্লেখ জরুরি যে, বঙ্গবন্ধুকে যখন বিদেশি-দেশি ষড়যন্ত্রকারীরা হত্যা করলো তখন তার বয়স ছিল মাত্র ৫৫ বছর, যার মধ্যে জীবনের শেষের মাত্র সাড়ে তিন বছর অর্থাৎ মাত্র ১৩১৪ দিন তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শাসনকাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ জরুরি যে, এ দেশে উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে এখন যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাও যদি বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসেবে ধরে নেয়া যায় তাহলেও সুস্থ-সবল-সুঠাম দেহের অধিকারী বঙ্গবন্ধু (১৯৭৫-এর পরে) আরো কমপক্ষে ২৪ বছর বাঁচতেন (কমপক্ষে বলছি এজন্য যে বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দেশের উর্ধ্বমুখী মানব উন্নয়নের কারণে মানুষের গড় আয়ু এখনকার তুলনায় কমপক্ষে ৫ বছর বাড়তো)। অর্থাৎ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-প্রগতি কর্মযজ্ঞ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে কমপক্ষে ২৪ বছর।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি-সমাজ আজ কোথায় পৌঁছাতো! হিসেবপত্তর করে [যাকে অর্থশাস্ত্রসহ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিজ্ঞানিরা সিমুলেশন (simulation model) বলে থাকেন] এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পাঁচটি

---

[৪১] 'অনুসিদ্ধান্ত' হল উপপাদ্য থেকে সহজে আসা যায় এমন সিদ্ধান্ত, যেখানে 'উপপাদ্য' হল যুক্তির দ্বারা সম্পাদন বা সমর্থন বা সমাধান অথবা প্রতিপাদন করা বা প্রমাণ করা।

[৪২] এ হত্যার কারণ-পরিণাম সম্পর্কে ইতোমধ্যে বলেছি। বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবার-পরিজনদের ১৭ জনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী (পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী নয়) হুবহু ব্যক্তি/ব্যক্তিসমূহ কে বা কারা তা প্রমাণ করা সহজ নয়। হত্যার পিছনের বিদেশি-দেশি প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারীদের নাম হয়তো বা কোনোদিনই ইতিহাসে উদঘাটিত হবে না। তবে হত্যা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা যতদূর জানা যায় সংক্ষেপে এরকম: ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট রাতের কুচকাওয়াজের নামে মেজর ফারুক এবং মেজর রশীদ প্রথম বেঙ্গল ল্যান্সার ও দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারির ৬০০ জওয়ানকে ঢাকা সেনানিবাসের বাইরে নিয়ে যায়; সফল অপারেশনের দায়িত্ব পালনকারী মেজর ফারুক সেনাদের তিন ভাগে বিভক্ত করেন: প্রথমভাগে ধানমণ্ডির ৩২ নং বাসায় বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের যাকেই পাওয়া যাবে তাকে হত্যার দায়িত্ব দেয়া হয় চাকুরিচ্যুত মেজর নূর এবং মেজর মহিউদ্দিনকে, দ্বিতীয়ভাগে মেজর ডালিমের দায়িত্ব হলো আব্দুর রব সেরনিয়াবতের বাড়ি আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করা, আর তৃতীয়ভাগে মেজর ফারুক ও রিসালদার মোসলেম উদ্দিনকে নির্দেশ দেয়া হয় শেখ ফজলুল হক মনিকে হত্যার; মেজর রশিদকে রাজনৈতিক দায়িত্ব দেয়া হয় যে তিনি যেন হত্যাকাণ্ডের পরপরই খন্দকার মোশতাক আহমেদকে রেডিও স্টেশনে এনে শেখ মুজিবের পতনের কথা ঘোষণা দেন এবং নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে মোশতাককে পরিচয় করিয়ে দেন। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার পরিজনদের হত্যার উদ্দেশ্যে মেজর নূর, মেজর মহিউদ্দিন এবং মেজর বজলুল হুদার নেতৃত্বে বিপথগামী সৈন্যরা ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ভোর ৫টা ১৫ মিনিটের দিকে পৌঁছায়। প্রথমে ক্যাপ্টেন হুদা শেখ কামালকে গুলি করে হত্যা করে। এরপরে মেজর নূর স্টেনগানের গুলি চালিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে (তখন ভোর ৫টা ৪০ মিনিট; বঙ্গবন্ধু দোতলায় উঠছিলেন), বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধুকে অনুসরণ করার সময়েই শয়নকক্ষের দরজার সামনে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। চলে গণহত্যা– কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয় শেখ জামালকে, শেখ কামাল ও শেখ জামালের নব বিবাহিত বধূ যথাক্রমে সুলতানা ও রোজিকে, ফার্নিচারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ১০ বছরের শেখ রাসেলকে খুন করা হয় যে শিশুটি খুনীদের অনুরোধ করে বলেছিলো "আমাকে মেরো না, আমাকে হাসু আপার (শেখ হাসিনা) কাছে পাঠিয়ে দাও"। ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ড– পরিবার-পরিজনসহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ড ঘটে গেলো। তবে প্রকৃতির কি বিধান যে বিধানের বলে পরিবার-পরিজনসহ বঙ্গবন্ধু নির্মমভাবে হত্যার শিকার হলেন কিন্তু বেঁচে গেলেন বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ সত্যতা নিশ্চিত করার স্বার্থে তাদের বেঁচে যাবার বিষয়টি লিখছি যা আমি ব্যক্তিগত কথোপকথনে শেখ হাসিনার মুখ থেকেই শুনেছি। তিনি যা বলেছেন তা এরকম: "১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে আব্বা (বঙ্গবন্ধু) ভাষণ দেবেন। ব্যাপক প্রস্তুতি চলছিলো। এসব নিয়ে সবাই ছিলো খুব ব্যস্ত। উপাচার্য আব্দুল মতিন চৌধুরি স্যার ঐ অনুষ্ঠানে আমাকে উপস্থিত থাকার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু ওদিকে জার্মানি থেকে ড. ওয়াজেদ আলীর ডাক। উপাচার্য মতিন চৌধুরি স্যারকে বললাম আপনার ছাত্রকে একটু বুঝান আমি ১৫ আগস্টের পরেই যাই। মতিন চৌধুরি স্যার বললেন ও আমার প্রিয় ছাত্র ছিলো, ফোনে বলে দেবো। শেষ পর্যন্ত কাজ হলো না। ২৯ জুলাই (১৯৭৫) আমাকে স্বামীর কাছে জার্মানি যেতে হলো। আর রেহানাকেও সাথে নিলাম।"

পদ্ধতিতত্ত্বীয় (methodological) বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রথমত: কয়েকটি যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্ত (hypothesis) ব্যবহার করা হয়েছে; আর অনুসিদ্ধান্ত ব্যবহার করা হয়েছে এ কারণে যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে বিদেশি-দেশি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ইতিহাসের নৃশংসতম ও বর্বরোচিতভাবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে অর্থাৎ ১৯৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশ হলো "বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ নয়"– "বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশ" বা "আজকের বাংলাদেশ"। আমার হিসেব-পত্তের ভিত্তি হিসেবে যেসব অনুসিদ্ধান্ত ব্যবহার করেছি তা নিয়ে যে কেউই বিতর্ক করতে পারেন (এ বিষয়ে পরে আসছি)। পদ্ধতিতত্ত্বীয় দ্বিতীয় বিষয়টি হলো "বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশ" অর্থাৎ "আজকের বাংলাদেশ" (যা সরকারি পরিসংখ্যান এবং/অথবা ক্ষেত্র বিশেষে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেশভিত্তিক পরিসংখ্যানিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে থেকেই হিসেব-পত্তর করা হয়েছে) এবং "বঙ্গবন্ধুসহ আজকের বাংলাদেশ" (যা সিমুলেশন মডেল ভিত্তিক আমার হিসেব) এসব তুলনার ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে বেছে নিয়েছি। দেশ হিসেবে অন্য যেকোনো দেশ বেছে নেয়া যেতো তবে তা না করে মালয়েশিয়াকে বেছে নেয়ার পিছনে প্রধানত দু'টি কারণ রয়েছে। কারণ দু'টি হলো (১) ১৯৭০-৭৩ সময়কালে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও মোট জাতীয় আয় (জিএনআই) ছিলো প্রায় সমান। তবে ১৯৭০ সালে মালয়েশিয়ার মোট জনসংখ্যা ছিলো আমাদের (পূর্ব পাকিস্তানের) তুলনায় প্রায় ৬.৫ গুণ কম (আমাদের ছিলো ৬ কোটি ৯১ লক্ষ আর মালয়েশিয়ার ১ কোটি ৬ লক্ষ)। যে কারণে মোট দেশজ উৎপাদন অথবা মোট জাতীয় আয় সমান বা কাছাকাছি হলেও মালয়েশিয়ার মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন অথবা মাথাপিছু জাতীয় আয় আমাদের তুলনায় ৫-৬ গুণ বেশি হবে সেটাই স্বাভাবিক– তাইই ছিলো ১৯৭০-৭৩-এর দিকের অবস্থা। (২) মালয়েশিয়ার অর্থনীতি বিনির্মিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী নেতা ড. মাহাথির মোহাম্মদ-এর নেতৃত্বে এবং বলা যায় "দেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শনের" (home grown development philosophy) ভিত্তিতে। সমজাতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব এবং "দেশজ উন্নয়ন দর্শন" উভয়ই আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ততদিন যতদিন বঙ্গবন্ধু দেশ পরিচালনে নেতৃত্ব দিয়েছেন (অর্থাৎ ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের ভোররাত পর্যন্ত)। তবে মালয়েশিয়ার সাথে আমাদের পথচলা শুরুর একটা বড় পার্থক্য আছে তা হলো আমাদের পথচলার শুরুটা (ধরা যাক ১৯৭২ সাল) যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ[৪৩] থেকে আর মালয়েশিয়ার পথচলা শুরু কোনো যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ থেকে নয়। আরো একটা বড় পার্থক্য আছে যা অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত তা হলো মালয়েশিয়ার নেতৃত্ব সমাজতন্ত্রের কথা বলেননি (আসলে নিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবক্তা ছিলেন), আর আমাদের বঙ্গবন্ধু তার উন্নয়ন দর্শনের অন্যতম প্রধান অবিচ্ছেদ্য মৌল হিসেবে সমাজতন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন (যা সংবিধানের চার মূল স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ)। পদ্ধতিতাত্ত্বিক তৃতীয় বিষয়টি হলো 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের বাংলাদেশের সম্ভাব্য চিত্র বিনির্মাণে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও মোট জাতীয় আয়-এর গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার ৫ শতাংশ, ৬ শতাংশ, ৭ শতাংশ, ৮ শতাংশ, ৯ শতাংশ ও ১০ শতাংশ ধরে ভিন্ন ভিন্ন হিসেব (সিমুলেশন) করা হয়েছে। তবে 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের সম্ভাব্য চিত্র উপস্থাপনে মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়ের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ_ হলে যা দাঁড়াতো সেটাকেই সবচে যুক্তিযুক্ত মনে করেছি। গড়ে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরার পিছনের যৌক্তিক কারণগুলো পরে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। পদ্ধতিতত্ত্বগত চতুর্থ বিষয়টি হলো সময় বা সময়কাল (বছর, বছরকাল) সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত পরিসংখ্যানের প্রাপ্যতা যা বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার তুলনা-সহায়ক হয় সেটাকেই মুখ্য বিবেচনা করা হয়েছে। যেমন মোট দেশজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৯৭০-২০১১ সময়কাল, মোট জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ১৯৭৩-২০১১ সময়কাল ব্যবহৃত হয়েছে। পদ্ধতিতাত্ত্বিক সর্বশেষ, পঞ্চম ক্ষেত্রটি হলো মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়সহ সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক চলকসমুহের মূল্য (price) বিষয়ক। বাংলাদেশের সাথে মালয়েশিয়ার অর্থনীতি তুলনীয় রাখার স্বার্থে মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয় (মাথাপিছুসহ) হিসেব করা হয়েছে ২০০০ সালের ভিত্তিতে স্থির মূল্যে (in constant price, বর্তমান মূল্য বা current price-এ নয়), আর মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় (পিপিপি ডলারে) হিসেব করা হয়েছে ২০০৫ সালের স্থির মূল্যে। বাংলাদেশি টাকা আর মালয়েশিয়ার রিংগেটভিত্তিক সব হিসেবপত্তর তুলনীয় করার স্বার্থে মার্কিন ডলারে রূপান্তর করা হয়েছে।

আগেই বলেছি, বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ'-এর অর্থনীতি ও সমাজ আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো তা নিরূপণে বেশ কিছু যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হিসেবপত্তর করেছি। এসব যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ধরে নিয়েছি যে বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার হতো ৯ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই বার্ষিক জিডিপি ৫.৫ শতাংশে উন্নীতকরণের টার্গেট নির্ধারণ করা

[৪৩] এমন এক ধ্বংসস্তূপ থেকে যা বিশ্লেষণ করে ১৯৭২ সালের দিকেই বিদেশি বিশেষজ্ঞগণ ও অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা আশংকা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ অত্যাসন্ন এবং অনাহারে ৫০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাবে। ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দালাল-দোসররা যে অপূরণীয়-অপরিমেয় ক্ষয়-ক্ষতি করেছিলো এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে।

হয়েছিলো। যেসব অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে "বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশে" মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ হতো সেসব অনুসিদ্ধান্ত উপস্থাপনের আগে নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করার স্বার্থে আর একটি বিষয় উত্থাপন জরুরি। বিষয়টি এরকম "বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশে" মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ হতো কিনা এ নিয়ে যে কেউই তর্ক-বিতর্ক অথবা কুটতর্কে অবতীর্ণ হতে পারেন। এসব তর্কবাগিশদের প্রতি পেশাগত যথাযোগ্য সম্মানপূর্বক অন্তত কয়েকটি কথা বলা জরুরি। যা নিম্নরূপ:

প্রথমত: যে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) পরিমাণে স্বল্প অথবা অপেক্ষাকৃত স্বল্প সে দেশে সঠিক, বিজ্ঞানসম্মত ও জনকল্যাণকামী অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি-কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হলে ঐ দেশে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও তার প্রবৃদ্ধির হার বাড়তে বাধ্য। এমনকি প্রবৃদ্ধির হার সে দেশে দুই অঙ্কের (ডবল ডিজিট) হতে পারে অর্থাৎ ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত। এ কোনো অসম্ভব প্রস্তাবনা নয়। এ উদাহরণ নতুন কোনো বিষয় নয়। অনেক দেশই ইতোমধ্যে এ ধরনের উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয়ত: যে দেশের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি অথচ মোট দেশজ উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম সে দেশে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত সহজ। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় নিশ্চিতকরণ জরুরি: (১) জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে, দক্ষ-জনশক্তিতে রূপান্তর, (২) সে ধরনের অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল গ্রহণ-প্রণয়ন-বাস্তবায়ন যার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অভিঘাত ধনাত্মক।

তৃতীয়ত: 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশের পরিবর্তে ৭ শতাংশ ধরলেও 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয় উভয়ই মালয়েশিয়ার তুলনায় অনেক বেশি হতো (যা পরে দেখানো হয়েছে)।

চতুর্থত: সংশয়বাদী, সন্দেহপ্রবণ, কুট তর্কবাগিশ ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা(!) বিদেশি-দেশি অর্থনীতিবিদ ও তথাকথিত সমাজ-রাষ্ট্র চিন্তকদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন জরুরি বোধ করি। প্রশ্নসমূহ সন্দেহাতীতভাবে রাজনৈতিক (মনে রাখা প্রয়োজন যে অর্থনীতি হলো আসলে বড় মাপের রাজনীতি; রাজনীতি হলো অর্থনীতির ঘনীভূত বহিঃপ্রকাশ)। রাজনৈতিক ঐ প্রশ্নসমূহ হলো: আপনারা কি ১৯৭০ সালেও ভাবতে পেরেছিলেন যে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করবো? আপনারা কি ভাবতে পেরেছিলেন যে আমরা ৯ মাসেই হাজার-লক্ষ প্রতিকূলতার মধ্যে একটি সশস্ত্র বলবান-নিয়মিত পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনী ও তাদের দেশীয়-আন্তর্জাতিক দালাল-দোসরদের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ঐ 'অসীম শক্তিধর' বর্বর পাকিস্তান আর্মিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারবো? আপনারা কি ভেবেছিলেন যে আমরা এতই দুর্বল যে মুক্তিযুদ্ধকালীন মোশতাক চক্রসহ বিদেশি-দেশি ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদেরকে আবারো পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে যে কোনো ফর্মুলায় ফেরত যেতে বাধ্য করবে, আর আমরা তা মেনে নিতে বাধ্য হবো? তারা সম্ভবত ভেবেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ প্রলম্বিত হবে এবং মুক্তিযোদ্ধাসহ তাদের সহযোগী এ দেশের আপামর জনগণ এক পর্যায়ে হাঁপিয়ে উঠে রণে ভঙ্গ দিয়ে হাটু গেড়ে ক্ষমা চাইবে। তারা সম্ভবত ভেবেছিলেন যে বঙ্গবন্ধু শুধু বক্তৃতা-পারদর্শী মানুষ দেশ গড়া তাও আবার অপূরণীয়-অপরিমেয় ক্ষয়-ক্ষতিপূর্ণ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ উন্নয়নে নেতৃত্ব দেয়া তাঁর কাজ নয়; এ বিষয়ে নন তিনি বিশেষজ্ঞ– নন তিনি পারদর্শী সুতরাং পারবেন না তিনি। এসব প্রতিক্রিয়াশীল ভাবুকদের অনেকেই সচেতনভাবেই সাম্রাজ্যবাদের দালাল অথবা বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ এর কেরানি অথবা শাস্ত্রিয়ভাবে সে পক্ষের ব্যক্তি যারা ক্ষুদ্রার্থের অর্থনীতি শাস্ত্রের বাইরে যেতে অপারগ[৪৪] অথবা 'জনগণের শক্তি সবকিছুর

[৪৪] 'বুদ্ধিজীবী শ্রেণি'র একাংশ 'অর্থনীতিবিদ শ্রেণি' এসব 'ভাবুক' যারা ক্ষুদ্রার্থের অর্থনীতি শাস্ত্রের বাইরে বিচরণে অপারগ তাদের উদ্দেশ্যে বলা সমিচিন যে তাদের খুব দোষ নেই; দোষ অর্থনীতি শাস্ত্রেরই অন্তর্নিহিত; দোষ তারা অর্থশাস্ত্রের যে ধারা অথবা স্কুল অনুসরণ করেন সেখানেই বড় মাপের গলদ আছে। এ গলদ সাধারণ কোনো গলদ নয়। এ গলদ প্রধানত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ধারণাগত সংকট উদ্ভূত– প্রকৃত সত্য উপলব্ধি না করতে পারার সংকট। বিজ্ঞানী ফ্রিটজফ কাপ্‌রার মতে বিষয়টি এরকম "উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্ব, জ্বালানী সংকট, স্বাস্থ্যসেবা খাতে সংকট, দূষণ ও অন্যান্য পরিবেশগত বিপর্যয়, সন্ত্রাস ও অপরাধের বাড়বাড়ন্ত, এবং অনুরূপ সবকিছু– এসবই একই সংকটের বিভিন্নমুখী চেহারা। সংকটটি মূলত উপলব্ধির সংকট" (দেখুন, ফ্রিটজফ কাপ্‌রা, ১৯৮৮, The Turning Point: Science, Society and the Rising Culture, পৃ. ১৫, New York: Bantam Books)। পুরো গত শতক আর এ শতকের এখন পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞানিরা (যারা মানুষের স্বভাব-আচরণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক নিয়ে ভাবেন, যেমন অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক নৃবিজ্ঞান, এমনকি ইতিহাস শাস্ত্র) সংশ্লিষ্ট বাস্তবতা বিচার-বিশ্লেষণে মূলত কার্টেজিয় ধারণাকাঠামো (Cartesian fremework) ব্যবহার করেছেন যে ধারণা কাঠামো অনুযায়ী দার্শনিক দেকার্তের জ্ঞানতত্ত্ব (যেখানে বলা হতো বস্তুর গতির আদি কারণ হচ্ছে ঈশ্বর; মানুষ হচ্ছে দেহ এবং মনের সম্মিলিত সংগঠন; দেহ হচ্ছে মনহীন বস্তু আর মন হচ্ছে বস্তুহীন সত্তা; "আমার নিজের অস্তিত্ব সন্দেহের উর্ধ্বে") থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে বলা হলো মানবিক-সামাজিক বিজ্ঞানের কাজ 'মন' (*res congnitans*) নিয়ে আর প্রকৃতি বিজ্ঞানের কাজ 'বস্তু' (*res extensa*) নিয়ে। বিজ্ঞানী ফ্রিটজফ বলছেন– প্রকৃত অর্থে বিশ্বকে সঠিকভাবে অনুধাবন ও উপস্থাপনে প্রয়োজন কার্টেজিয় ধারণা কাঠামো

ঊর্ধ্বে'- এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী নন। আমি নিশ্চিত এদের অধিকাংশই বঙ্গবন্ধুর যোগ্যতা-দক্ষতা-দেশপ্রেম সম্পর্কে জানতেন না অথবা ভাবতেন অর্থনীতি ও সমাজ উন্নয়নে দরিদ্র বিরোধী ধনিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী বৈষম্যসৃষ্টিকারী বাজার ব্যবস্থাটাই উন্নয়নের একমাত্র মহৌষধ। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধে ধ্বংস-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের যখন খুবই প্রয়োজন ছিল তখন বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে দাতা দেশগুলো দাবি তুললো যে, "বাংলাদেশ যদি সাবেক পাকিস্তানের ঋণের দায়ের একাংশের (যে অংশ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত হয়েছিলো বলে তারা দাবি করেছিলো) দায়িত্ব গ্রহণ না করে, তবে বাংলাদেশকে তাদের পক্ষে সাহায্য প্রদান অসম্ভব"। যাদের উদ্দেশ্যে এত কথা বলছি তারা কি জানেন যে ঐ দুর্দিনেও বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "দাতামহল দাবি না ছাড়লে আগামীকালই তারা চলে যেতে পারেন। আমরা সাহায্য নেবো না। ওই সব শর্তে আমরা সাহায্য নিতে পারি না।" তারা কি জানেন, যে এ প্রক্রিয়ায় বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করলে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ ও নীতির প্রশ্নে অটল বঙ্গবন্ধু বিশ্বব্যাংকের ঐ ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেবকে কম কথায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন "শুনেছি আপনারা বলেছেন যে, বৈদেশিক সাহায্য পেতে হলে দাতামহলের শর্ত মানতে হবে আগে। ভদ্র মহোদয়গণ, এই যদি আপনাদের শর্ত হয়ে থাকে, তাহলে কোনো সাহায্যই আমরা নেবো না। আমাদের জনগণ রক্ত দিয়ে এদেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছে, এ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে, আমাদের বাঁচতে হলে জনগণের সে শক্তিকে কাজে লাগিয়েই বাঁচতে হবে। আমরা আপনাদের সাহায্য ছাড়াই চলবো।"[৪৫]

এতক্ষণ যেসব সংশয়-সন্দেহবাদী কুটতর্কবাগিশ এদেশি অথবা এদেশের ভিনদেশি অথবা বিদেশি অর্থনীতিবিদ-সমাজচিন্তকদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করলাম এবং সেই সাথে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম-নীতি-আদর্শ-জনগণের অপার শক্তির প্রতি আস্থার কিছু নমুনা উল্লেখ করলাম তাদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো ক্ষোভ-বিক্ষোভ-আক্রোশ-ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই (এদের বেশির ভাগকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব একটা চিনি না; তাদের লেখা-ঝোকা পড়েছি মাত্র)। তবে এদের জন্য দুঃখ হয় এজন্য যে, এদেরই বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এডিবিসহ সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি করেছেন অথবা চাকরি থেকে অবসর নিয়ে (সম্ভবত দুদেশি পাসপোর্টধারী হিসেবে) হয় বিদেশে অথবা বাংলাদেশে এখন প্রত্যক্ষ সরকার-ঘনিষ্ঠ উন্নয়ন-পরামর্শক (সরকারে যে দলই থাকুক না কেনো) হিসেবে কাজ করছেন এবং/অথবা উন্নয়ন পরামর্শ-প্রেসক্রিপশন প্রদানকারী সংস্থার মালিক এবং/অথবা আমাদের দেশের "উন্নয়ন" কিভাবে কোন পথে হতে পারে এসব নিয়ে চিন্তা-দুশ্চিন্তার দোকান "Think Tank" খুলে বসেছেন!

আগেই বলেছি বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' ১৯৭৩ থেকে ২০১১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াতো ৯ শতাংশ। এ হিসেব নিরূপণে বিভিন্ন যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ধরে নিয়েছি যে বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' ২০১১ সাল নাগাদ (তখন বঙ্গবন্ধুর বয়স হতো ৯০ বছর) তিনি মোট ৭টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ণ সময়সহ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম ৩ বছর সময় পেতেন। ধরে নিয়েছি যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) শেষ বছর নাগাদ প্রবৃদ্ধির হার গিয়ে দাঁড়াতো ৫.৫ শতাংশে (যে টার্গেট বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকীতেই ছিল)। ক্রমান্বয়ে এক পর্যায় পর্যন্ত প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে ডাবল ডিজিটে (দুই অঙ্কে) উন্নীত হতো। বঙ্গবন্ধুর "স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শনের" প্রভাব-অভিঘাত হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন সম্ভাবনাসহ ঐতিহাসিক

থেকে বেরিয়ে "ইকোলজিক্যাল চিন্তা-অবস্থান" (অর্থাৎ যে বিদ্যায় পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীজগতের সম্পর্ক আলোচিত হয়) গ্রহণ করা (ফ্রিটজিফ কাপ্‌রা, ঐ, পৃ. ১৬)। দেকার্ত ও কার্টেজিয় ধারণা সংশ্লিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বীয় এসব কথাবার্তা দর্শন শাস্ত্রীয় বিধায় অর্থনীতির জন্য আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ নিউটনের পদার্থবিদ্যা-বলবিদ্যা আর কার্টেজিয় প্যারাডাইম– এ দুয়ের সমন্বয়ে সামজিক বিজ্ঞানীরা বিশেষত অর্থনীতিবিদেরা এতকাল স্ব-শাস্ত্রিয় যেসব বিষয়াদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে মডেল বিনির্মাণ করে চলেছেন সেসবই প্রতিনিয়ত ভ্রান্ত প্রমাণিত হচ্ছে, প্রমাণিত হচ্ছে বাস্তবের সাথে যোগসূত্রহীন শাস্ত্র হিসেবে। বর্তমান যুগের অর্থশাস্ত্র সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য সকল জ্ঞান-শাখার মতই খণ্ডিত ও লঘুকৃত এপ্রোচ (fragmented and reductionist approach) দ্বারা পরিচালিত। এসব কারণেই প্রচলিত অর্থনীতিবিদেরা অর্থাৎ 'অর্থনীতিবিদ শ্রেণি' "বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে অর্থনীতি শাস্ত্র সামুহিক/সামগ্রিক ইকোলজিক্যাল ও সোশাল সিস্টেমের ক্ষুদ্র একটি দিক মাত্র যেখানে জীবন্ত ঐ সিস্টেমে মানুষ একে অন্যের সাথে এবং প্রকৃতির সম্পদের সাথে প্রতিনিয়ত সম্পর্কিত, যে প্রকৃতির বেশির ভাগই প্রাণ-বিশিষ্ট সত্ত্বা। সামাজিক বিজ্ঞানের মৌলিক ভ্রান্তি হলো এই যে তারা এ সামুহিক-অন্তসম্পর্কিত গঠন-কাঠামোকে বিভাজিত করে খণ্ডিত করে, এবং প্রতিটি অংশকে ভিন্ন অংশ মনে করে বিভিন্ন একাডেমিক বিভাগে চর্চা করে, এভাবেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অর্থনৈতিক শক্তির মৌল বিষয়াদি অবজ্ঞা করেন আর অর্থনীতিবিদেরা তাদের মডেলে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা যুক্ত করতে ব্যর্থ হন। ... অন্য আরো একটা অতিব গুরুত্ববহ বিষয় যা অর্থনীতিবিদেরা অতিমাত্রায় অবজ্ঞা করেন তা হল– অর্থনীতির গতিময় (dynamic) বিবর্তন। ... জীবনের বিষয়াদি খন্ডিতকরণের এবং পৃথক কামরাভুক্ত করার কারণে তাত্ত্বিক সমস্যার গাণিতিক সমাধানে অর্থনীতিবিদদের আর তেমন কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না।... মূল্য আছে কিন্তু মূল্যায়িত করা হয় না– এ দিক থেকে অর্থনীতিবিদরা এতকাল পর্বতসম ব্যর্থ চর্চা করেছেন "(বিস্তারিত দেখুন, ফ্রিটজফ কাপ্‌রা, ১৯৮৮, পৃ. ১৮৮-১৯১)। অর্থনীতিবিদ শ্রেণির এসব মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে কথার ফুলঝুরির শেষ নেই। তবে এক্ষেত্রে একটি চাণক্য শ্লোক প্রণিধানযোগ্য হতে পারে– "বৃক্ষহীন দেশে ভেরেন্ডা গাছও বৃক্ষ বলে পরিগণিত হয়"।

[৪৫] এ অংশের অধিকাংশ তথ্য-উৎস হলো বঙ্গবন্ধু সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের স্মৃতিচারণ এবং মোতাহার হোসেন সুফী রচিত গ্রন্থ "ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক" (অনন্যা প্রকাশনা, ২০০৯, পৃ: ৪০৫-৪০৭)।

অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির

যুক্তিতে ধরে নিয়েছি যে ঐ প্রবৃদ্ধির হার হতো: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৭৮-৮৩) ৭.৫ শতাংশ, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৮৩-৮৮) ৮.৫ শতাংশ, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৮৮-৯৩) ৯.৫ শতাংশ, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৯৩-৯৮) ১০ শতাংশ, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৯৮-২০০৩) ১০.৫ শতাংশ, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (২০০৩-০৮) ১১ শতাংশ এবং অষ্টম পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে একই ধারা বজায় থাকতো অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির হার হতো ১১ শতাংশ। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এসব হিসেব করলে ১৯৭৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সময়কালে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার হতো বার্ষিক গড়ে ৯ শতাংশ। আর অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবৃদ্ধির হারে ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে শুধুমাত্র মোট দেশজ উৎপাদনের কয়েকগুণ বৃদ্ধিই ঘটতো না সেইসাথে ধরে নেয়া অনুসিদ্ধান্তসমূহের বৈশিষ্ট্যের কারণে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যও বহুগুণ হ্রাস পেতো। আমার মতে এটাই ছিল বঙ্গবন্ধু উদ্ভাবিত "দেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শনের" অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য যাকে এক কথায় যে নামে সূত্রায়িত করা যায় তা হল "বৈষম্যহ্রাসকারী ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মডেল" অথবা "বৈষম্যহ্রাসকারী প্রগতির মডেল" অথবা "বৈষম্যহ্রাসকারী উন্নয়ন মডেল" অথবা "অসমতা হ্রাসকারী প্রগতির মডেল" অথবা "অসমতা হ্রাসকারী উন্নয়ন মডেল"। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে" কি হতো, কেমন হতো অর্থনীতি ও সমাজের আজকের রূপ? সেক্ষেত্রে প্রক্ষেপণের (projections) ভিত্তি হিসেবে যেসব যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্ত বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ:

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৯৭২-এর সংবিধানে বিধৃত চার মূলনীতির (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ) ভিত্তিতে জনগণের সার্বভৌমত্ব– জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭) ও জনগণের মৌলিক অধিকার সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার অন্যতম হল: মালিকানার নীতি (অনুচ্ছেদ ১৩), মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ১৫), বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব (অনুচ্ছেদ ১৬) এবং ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য প্রদর্শন না করা (অনুচ্ছেদ ২৬), অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা (অনুচ্ছেদ ১৭), জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা (অনুচ্ছেদ ২০), নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য (অনুচ্ছেদ ২১), চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৯), ধর্মীয় স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৪১), স্থানীয় শাসন (অনুচ্ছেদ ১১,৫৯,৬০), সংসদীয় গণতন্ত্র এবং আইন প্রণয়ন ও অর্থসংগ্রহ পদ্ধতি (অনুচ্ছেদ ৬৫-৯২), বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি (অনুচ্ছেদ ৯৪-১১৬), এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি (অনুচ্ছেদ ১১৮-১২৬)। সেই সাথে সংবিধানের মূল বিধান অনুযায়ী ধরে নেয়া হয়েছে যে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসমঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে [অনুচ্ছেদ ৭ (২)]– অর্থাৎ জনগণকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না; মালিকানার নীতি সংবিধানে বর্ণিত বিধি মোতাবেক হতে হবে (অর্থাৎ বিশ্ব-ব্যাংক, আইএমএফ তুষ্টি চলবে না; রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের বেসরকারিকরণ সংবিধান বিরোধী); গ্রাম-শহরের বৈষম্যহ্রাস করবেন কিন্তু কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার করবেন না– তা হবে না; বস্তিবাসী বাড়তেই থাকবে– তা হবে না; জাত-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষে বৈষম্য প্রদর্শন করবেন– তা হবে না; শিক্ষাকে পণ্যে (বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শিক্ষাবস্তু'তে) রূপান্তরিত করবেন– তা সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী; ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী মানুষকে নিরন্তর উচ্ছেদ প্রক্রিয়াভুক্ত করে রাখবেন– তা হবে না; স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করবেন না– তা সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী; সমাজতন্ত্রের নাম-নিশানা নেবেন না– তা হবে না; ধর্মকে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনবেন– তা শুধু সংবিধান বিরোধীই নয় তা মুক্তিযুদ্ধের মৌল চিন্তা বিরোধী; শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য বাড়াতেই থাকবেন– তা চলবে না; অসাম্প্রদায়িক জাতিয়তাবাদ অন্য কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করবেন– তা হবে না; আইনের শাসনের ব্যত্যয় ঘটাবেন– তা হবে না।

২. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে (বাস্তবে হয়নি; পরিকল্পনাকাল ছিল ১৯৭৩-৭৮ আর বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় ১৯৭৫-এ)।

৩. বঙ্গবন্ধু প্রস্তাবিত গণমুখী সমবায় আন্দোলন বাস্তবায়িত হয়েছে (যা বাস্তবে হয়নি)। যার অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল বাধ্যতামূলক বহুমুখী সমবায়সহ গ্রামীণ কৃষক সমবায়, তাঁতী সমবায়, জেলে সমবায়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায়।

৪. অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে (যা আসলে হয়নি)– খাদ্য উৎপাদন ও কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিসহ বৈদেশিক পরনির্ভরশীলতা হ্রাসের মাধ্যমে।[৪৬]

৫. মানবসম্পদসহ প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে[৪৭] (যা আসলে হয়নি)।

৬. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার কর্মকাণ্ড সাংবিধানিক ও ন্যায়বিধানিক দৃষ্টিতে বাস্তবায়িত হয়েছে (যা আসলে হয়নি)।

৭. জাতীয়করণকৃত কল-কারখানা-ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত পরিকল্পিত উন্নয়ন ও উত্তরোত্তর বিকাশ হয়েছে (যা আসলে হয়নি)।

৮. অবকাঠামোর কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়েছে– প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলে যার ভবিষ্যত নির্দেশনা উল্লেখ হিসেবে করা হয়েছিল রাস্তা-ঘাট-ব্রিজ, কালভার্ট, জলপথের/নদীর নাব্যতা রক্ষা করে দেশব্যাপী একক জলপথ-জাল, সমুদ্র-নদী-স্থলবন্দর, বিদ্যুত-জ্বালানি ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে (যা কাঙ্খিত পর্যায়ে হয় নি)।

৯. সরকারি স্বাস্থ্য খাতে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কভারেজ ও মান বৃদ্ধি হয়েছে (যা কাঙ্ক্ষিত পরিকল্পনানুযায়ী আসলে হয়নি)।

১০. লাইসেন্স পারমিট ও সংশ্লিষ্ট ঘুষ-দুর্নীতি নির্মূল হয়েছে (আসলে আদৌ হয়নি। যা ১৯৭৪-এর দিকে বেশি পরিলক্ষিত হয় এবং যা rent seeker-দের এক নব্য-ধনী গোষ্ঠী সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে কারণে বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের শেষ জনসভার ভাষণে– ২৬ মার্চ ১৯৭৫– বলেছিলেন "পাকিস্তান সব নিয়ে গেছে, কিন্তু এই চোরাদের তারা নিয়ে গেলে বাঁচতাম")।

১১. পাকিস্তানি বর্বর সেনাদের দালাল-দোসর যুদ্ধাপরাধী ও মানবাধিকার চরম লঙ্ঘনকারীদের বিচার ও বিচারিক রায় কার্যকর হয়েছে (যা আসলে হয়নি। প্রক্রিয়াধীন। এ প্রক্রিয়ার শেষ হবে কবে– কেউই জানে না। এরাই পরবর্তীকালে একদিকে যেমন বঙ্গবন্ধু সরকার বিরোধী ও দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক ছিল আর অন্যদিকে এরাই ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়ে মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক জঙ্গিত্বের বাহক হলো)।

১২. পাকিস্তান ফেরত সেনা কর্মকর্তাদের পুনর্বাসিত করা হলো না (আসলে করা হলো। বস্তুত এরাই তারা যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কোনোকিছুই ধারণ করতেন না, বরঞ্চ উল্টোটাই করেছেন। আর এদের অনেকেই এখন ভেতর থেকে অথবা বাইরে থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন)।

১৩. মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টাতেই যেসব বাঙালি আমলা পাকিস্তানিদের স্বার্থ রক্ষার্থে নিয়োজিত ছিল তাদের পুনর্বাসিত না করে শাস্তি দেয়া হলো (বাস্তবে হয়েছিল ঠিক উল্টোটা। ঐসব আমলাদের অনেককেই পুনর্বাসিত করা হলো। ঐ আমলারা মানসিকভাবে ছিলেন উপনিবেশিক ও মুসলিম লীগ–সামন্তবাদী মানসিকতার আমলা। চেয়ারে বসিয়ে যাদের দিয়ে আর যাই হোক সংবিধানের চার মূল স্তম্ভের কোনটিই বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না)।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' যে বাংলাদেশ হবার কথা ছিল সে বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা যায়নি; সেই বাংলাদেশের সাথে আজকের বাংলাদেশের ব্যবধান দুস্তর; আজকের বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশের উল্টো প্রকৃতির; আজকের বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' নয়। সেই সাথে এটাও বলা দরকার যে, বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' উপরোল্লিখিত অনুসিদ্ধান্তসমূহের কোনটা কোন মাত্রায় অথবা কোন অনুসিদ্ধান্তের মান কত হতো তা বলা দুস্কর। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' মূল অনুসিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর হতো এবং অনুসিদ্ধান্তসমূহের যৌথ মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্টি হতো নতুন এক বাংলাদেশ যাকে আমি বলছি "বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ"। যে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন

---

[৪৬] বঙ্গবন্ধু তার জীবনের শেষ জনসভায় (২৬ মার্চ ১৯৭৫, রেসকোর্স ময়দানে) বলেছিলেন "আমি ভিক্ষুক জাতির নেতা থাকতে চাই না"। এছাড়া আগেই উল্লেখ করেছি ১৯৭২ সলে বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে দাতামহল যখন দাবি জানালো যে পাকিস্তানের ঋণের দায়ের একাংশের দায়িত্ব বাংলাদেশকে নিতে হবে তখন বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্টকে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট বলেছিলেন "এই যদি আপনাদের শর্ত হয়ে থাকে, তাহলে কোনো সাহায্যই আমরা নেবো না।" তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিলো "বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ৬২ শতাংশ থেকে ১৯৭৭-৭৮ এর মধ্যে ২৭ শতাংশের মধ্যে কমিয়ে আনা।

[৪৭] মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব ছিল জ্ঞান-সমৃদ্ধ দক্ষ-প্রশিক্ষিত জনশক্তি গঠনের এবং এ লক্ষ্যের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ এর দিকে। এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন মানুষের অভিজ্ঞান-সচেতনতা-দক্ষতা বৃদ্ধি পেতো অন্যদিকে অর্থনীতিতে মানুষের উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন সক্ষমতা ও ফলপ্রদতা বৃদ্ধি পেতো। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার কথা বঙ্গবন্ধু বহুবার বলেছেন এবং সর্বশেষ বলেছেন ১৯৭৫-এর ২৬ মার্চ জীবনের শেষ জনসভার ভাষণে– যা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি।

হতো কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় এবং বৈষম্য হ্রাস পেতো অনেক গুণ। হিসেব-পত্তর কষে এসব বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে যা পেয়েছি তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। তার আগে আবারো স্মরণ করে দিতে চাই যে, ১৯৭০-২০১১ অথবা ১৯৭৩-২০১১ সময়কালের জন্য বৃহৎ বর্গের মানদণ্ডে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দেখা হয়েছে দু'ভাবে: "আজকের বাংলাদেশ" (অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার ফলে যে বাংলাদেশ পেয়েছি অথবা 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশ') এবং 'বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ' (অর্থাৎ যদি বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকতেন' এবং উল্লিখিত অনুসিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হতো)। আর এ দুই বাংলাদেশকে তুলনা করা হয়েছে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের মালয়েশিয়ার একই সময়ের অর্থনীতির সাথে। সেই সাথে অর্থনীতিতে পরিবর্তন-রূপান্তরের পাশাপাশি সমাজের শ্রেণি কাঠামোতে কি ঘটেছে এবং কি ঘটতে পারতো সেটাও হিসেব-পত্তর করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং উল্লিখিত অনুসিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর হলে (যা বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যর কারণেই অবশ্যই কার্যকর হতো বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের কার্যকারিতার মাত্রা যাই হোক না কেন) অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিরিখে আজকের 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের অর্থনীতি আজকের মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে অনেকগুণ ছাড়িয়ে যেতো যদিও ১৯৭৩ সালের দিকে ঐ দুই অর্থনীতির অবস্থা মোটামুটি একই রকম ছিল। সেইসাথে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিগত বৈষম্যের চেহারা কাঠামোটি পাল্টে যেত এবং শ্রেণিবৈষম্য হ্রাস পেয়ে তা সমতাভিমুখি হতো যা আজকের বাংলাদেশে চরম বৈষম্যমূলক এবং যে পরিবর্তনটি মালয়েশিয়ায় আদৌ হয়নি (বিষয়টি পরে বিস্তারিত বিশ্লেষিত হয়েছে)।

প্রথমে আসা যাক বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বড় দাগে অর্থনৈতিক পরিবর্তনটা কেমন হতে পারতো, কোন অবস্থায় দাঁড়াতো আজকের 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার অর্থনীতির তুলনায় সম্ভাব্য অবস্থাটা কেমন হতো? 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের[৪৮] বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) হতো ৪২ হাজার ১৫৮ কোটি ডলার যা একই সময়ের মালয়েশিয়ায় ১৫ হাজার ৪২৬ কোটি ডলার অর্থাৎ বাংলাদেশের জিডিপি মালয়েশিয়ার তুলনায় আজ ২.৭৩ গুণ বেশি হতো (দেখুন, লেখচিত্র ৩); এমনকি মাথাপিছু জিডিপি আজকের মালয়েশিয়াকে ছাড়িয়ে যেতো– মালয়েশিয়ার মাথাপিছু জিডিপি ৫,৩৪৫ ডলার আর 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আমাদের হতো ৬,০৬১ ডলার (দেখুন, লেখচিত্র ৪) আর এটা ঘটতো তখন যখন আমাদের মোট জনসংখ্যা মালয়েশিয়ার চেয়ে প্রায় ৪ গুণ বেশি (আর ১৯৭০ সালে ৬.৫ গুণ বেশি ছিল, দেখুন, লেখচিত্র ৫)। এতো গেল মোট দেশজ উৎপাদনের কথা। সংগত কারণেই মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) ক্ষেত্রেও 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের অনুরূপ উর্ধ্বগামী পরিবর্তনের ফলে এখন আমাদের মোট জাতীয় আয় দাঁড়াতো ৪২ হাজার ৫১৪ কোটি ডলারে। যা মালয়েশিয়ায় ১৫ হাজার ৫ কোটি ডলার অর্থাৎ মালয়েশিয়ার মোট জাতীয় আয়ের তুলনায় 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আমাদের মোট জাতীয় আয় ২.৮ গুণ বেশি হতো (দেখুন, লেখচিত্র ৬)। শুধু তাই নয়– মালয়েশিয়ার তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা ৪ গুণ বেশি হলেও আমাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় হতো ৫,৫৯৮ ডলার যা মালয়েশিয়ায় ৫,১৯৯ ডলার (দেখুন, লেখচিত্র ৭), অর্থাৎ মালয়েশিয়ার তুলনায় মাথাপিছু ৩৯৯ ডলার বেশি। আর মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের[৪৯] ক্ষেত্রে বলা চলে ঘটনাটা ঘটতে পারতো বিপ্লবাত্মক (পরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। এতো গেলো 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অর্থনীতির প্রধান দুই সূচক মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়ে যে আমূল পরিবর্তন হয়ে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে অতিক্রম করার মোটা দাগে মোদ্দা কথা। এখন একটু বিস্তারিত বিশ্লেষণে আসা প্রয়োজন যেখানে 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের সাথে আজকের মালয়েশিয়ার, 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের সাথে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের, এবং 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের সাথে মালয়েশিয়ার অর্থনীতির (যা কিছু মাত্রায় উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) তুলনীয় অবস্থা দেখানো সম্ভব।

লেখচিত্র ৩: মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি): ১৯৭০-২০১১
(২০০০ সালের সালের স্থির মূল্যে, কোটি ডলারে)

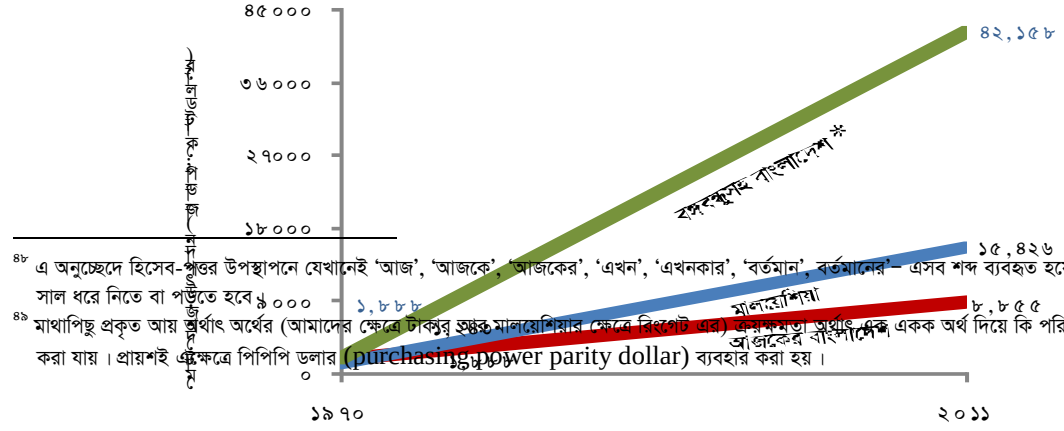

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

[৪৮] এ অনুচ্ছেদে হিসেব-পত্তর উপস্থাপনে যেখানেই 'আজ', 'আজকে', 'আজকের', 'এখন', 'এখনকার', 'বর্তমান', বর্তমানের'– এসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই ২০১১ সাল ধরে নিতে বা পড়তে হবে।

[৪৯] মাথাপিছু প্রকৃত আয় অর্থাৎ অর্থের (আমাদের ক্ষেত্রে টাকার আর মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে রিংগেট এর) ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ এক একক অর্থ দিয়ে কি পরিমাণে পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করা যায়। প্রায়শই এক্ষেত্রে পিপিপি ডলার (purchasing power parity dollar) ব্যবহার করা হয়।

লেখচিত্র ৪: মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন: ১৯৭০-২০১১
(২০০০ সালের স্থির মূল্যে, ডলারে)

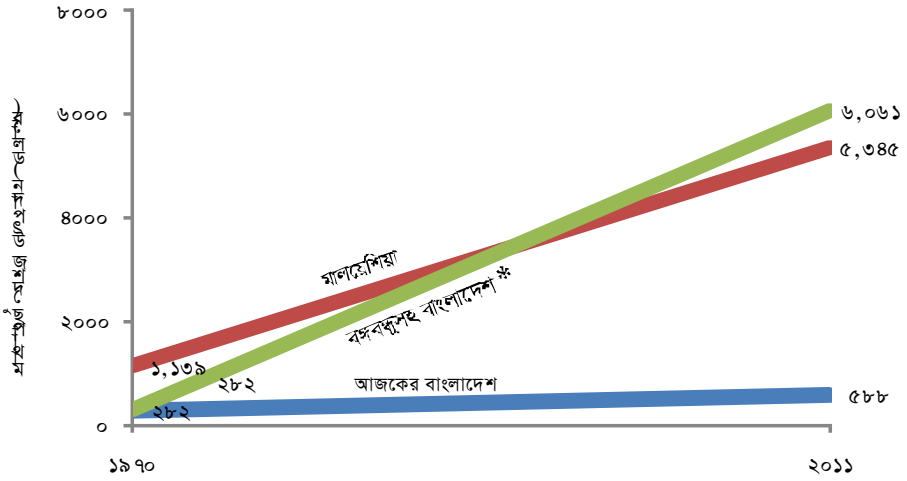

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

লেখচিত্র ৫: বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার জনসংখ্যা (মিলিয়নে): ১৯৭০-২০১১

তথ্য উৎস: বাংলাদেশের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন সনের "Statistical Year Book"; ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ প্রবন্ধকার কর্তৃক জনসংখ্যার গতি প্রবণতা ধরে হিসেবকৃত। আর মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

লেখচিত্র ৬: মোট জাতীয় আয় (জিএনআই: ১৯৭৩-২০১১
(২০০০ সালের স্থির মূল্যে, কোটি ডলারে)

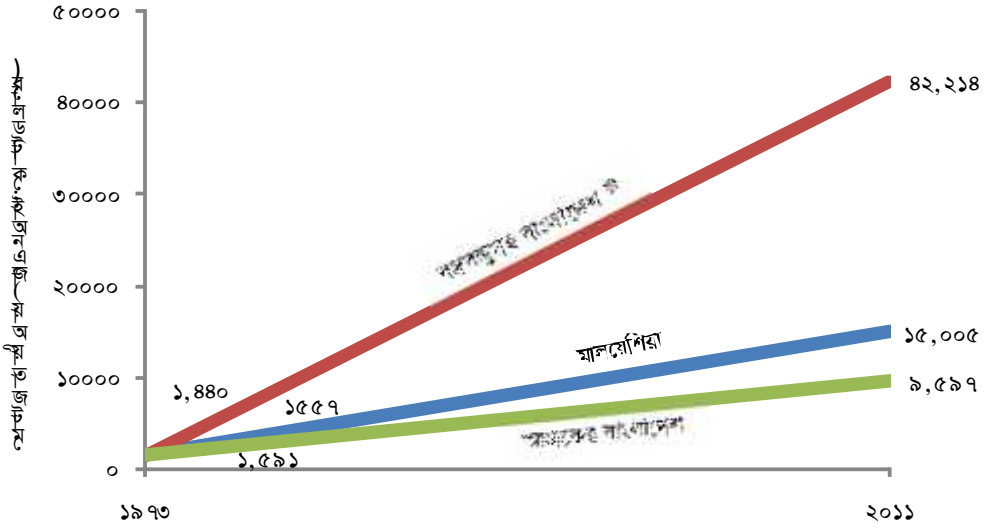

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

লেখচিত্র ৭: মাথাপিছু জাতীয় আয়: ১৯৭৩-২০১১
(২০০০ সালের স্থির মূল্যে, ডলারে)

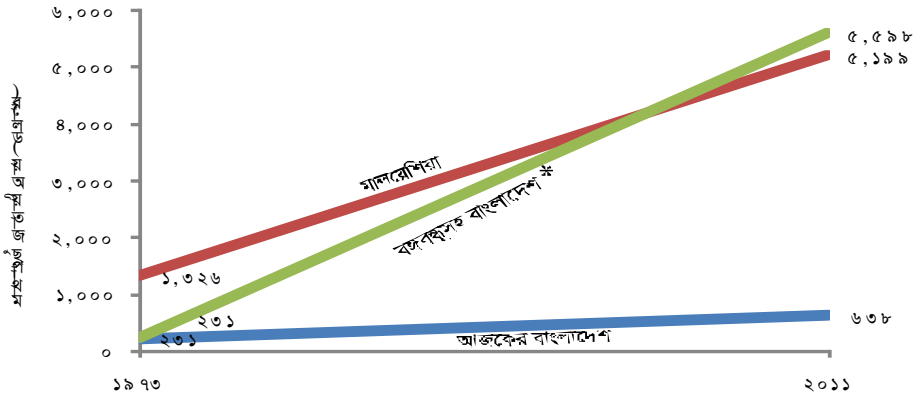

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়িত হলে (যা অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে ইতোমধ্যে বিবৃত হয়েছে) অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এখন বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর সম্ভাব্য পরিমাণ হতো ৪২ হাজার ১৫৮ কোটি ডলার কিন্তু 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে তার পরিমাণ মাত্র ৮ হাজার ৮৫৫ কোটি ডলার[৫০] (দেখুন, লেখচিত্র ৫)। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা

[৫০] বিভ্রান্তি এড়ানোর স্বার্থে বাংলাদেশে ২০১১ সালের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৯৫-১৯৯৬ ভিত্তি বছর ধরে ২০১১ সালের মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ বলা হয়েছে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ ৫,৫০২ কোটি ডলার (১ ডলারে ৭০

করে সেনা-স্বৈরশাসন ও স্বৈরশাসনের মোড়কে তথাকথিত গণতান্ত্রিকতার নামে লুণ্ঠনকারী rent seeker গোষ্ঠী সৃষ্টিসহ অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখি বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ তথা সাম্রাজ্যবাদ পুষ্ট নয়াউদারবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতি দর্শন যা উন্নয়নবান্ধব নয় দরিদ্রবান্ধব তো নয়ই। আর এ জনকল্যাণবিমুখ স্বদেশবিমুখ উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নের ফলে বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' সম্ভাব্য মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ যা হতে পারতো তা আদৌ হয়নি, হয়েছে তার মাত্র ২১ শতাংশের সমপরিমাণ। অর্থাৎ মোটা দাগে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের তুলনায় 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে আমরা ২০১১ সালে মোট দেশজ উৎপাদন হারিয়েছি (৪২,১৫৮ বিয়োগ ৮,৮৫৫) ৩৩ হাজার ৩০৩ কোটি ডলারের সমপরিমাণ। এ ক্ষতি বলা চলে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার কারণে মাত্র এক বছরের (২০১১ সালের) আনুমানিক ক্ষতি। এভাবে ১৯৭৫ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ৩৬ বছরে প্রতি বছরের ক্ষতি যোগ করলে পুঞ্জীভূত যে ক্ষতি হবে তার সম্ভাব্য পরিমাণ আমার হিসেবে ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৮৯ কোটি ডলার। এখন বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন ৮ হাজার ৮৫৫ কোটি ডলার আর মালয়েশিয়ার ১৫ হাজার ৪২৬ কোটি ডলার অর্থাৎ মালয়েশিয়ার মোট দেশজ উৎপাদন আমাদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ অথচ বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং তার উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়িত হলে আজ আমাদের মোট দেশজ উৎপাদন হতো মালয়েশিয়ার তুলনায় ২.৭৩ গুণ বেশি (আমাদের হতো ৪২ হাজার ১৫৮ কোটি ডলার; দেখুন, লেখচিত্র ৩)। শুধু তাই নয় 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে মাথাপিছু দেশজ উৎপাদনে কল্পনাতীত উর্ধ্বগামিতা অর্জন সম্ভব হতো– 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে এখন (২০০০ সালের স্থির মূল্যে) মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন ৫৮৮ ডলার আর মালয়েশিয়ার ৫,৩৪৫ ডলার (অর্থাৎ আমাদের তুলনায় ৯ গুণ বেশি), কিন্তু 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে ঐ মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন মালয়েশিয়াকে অতিক্রম করে হতো ৬,০৬১ ডলার (অর্থাৎ মালয়েশিয়ার তুলনায় মাথাপিছু ৭১৬ ডলার বেশি)। মাথাপিছু ব্যাপারটা নেহায়েতই গড়ের ব্যাপার। সুতরাং প্রকৃত উন্নয়নের খুব ভাল মানদণ্ড নাও হতে পারে যদি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য-বঞ্চনা ক্রমাগত বাড়ে (যেটাই আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেরই বাস্তব চিত্র)[৫১]। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে একদিকে মাথাপিছু সম্ভাব্য দেশজ উৎপাদন হতো ৬,০৬১ ডলার আর অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের অন্তর্নিহিত বেশিষ্ট্যের কারণেই বৈষম্য হ্রাস পেতো অনেকগুণ অর্থাৎ এই মাথাপিছু উচ্চ দেশজ উৎপাদন হতো বৈষম্য হ্রাসকারী মাথাপিছু উৎপাদন।

এতক্ষণ যা বললাম তা মূলত মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও মাথাপিছু দেশজ উৎপাদনের কথা। আসা যাক জাতীয় আয়ের (জিএনআই) প্রসঙ্গে। 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে এখন মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ ৯ হাজার ৫৯৭ কোটি ডলার[৫২] আর মালয়েশিয়ার ১৫ হাজার ৫ কোটি ডলার (অর্থাৎ আমাদের তুলনায় ১.৫৬ গুণ বেশি; দেখুন, লেখচিত্র ৬)। কিন্তু বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এখন আমাদের মোট জাতীয় আয় হতো ৪২ হাজার ২১৪ কোটি ডলার যা মালয়েশিয়ার তুলনায় ২.৮ গুণ বেশি আর 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় ৪.৪ গুণ বেশি। অন্যভাবে বলা যায় 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় এখন হতো মালয়েশিয়ার চেয়ে ২৭ হাজার ২০১ কোটি ডলার বেশি, আর 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় সেটা হতো ৩২ হাজার ৬১৭ কোটি ডলার বেশি। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ে এ উল্লম্ফন বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের কারণেই ঘটতো। একই সাথে বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' জনবহুল বাংলাদেশে এখন মাথাপিছু জাতীয় আয় মালয়েশিয়াকে অতিক্রম করে ৫,৫৯৮ ডলারে দাঁড়াতো যেখানে মালয়েশিয়ার মাথাপিছু জাতীয় আয় ৫,১৯৯ ডলার আর 'বঙ্গবন্ধুহীন'

টাকা হিসেবে); আর ২০০৫-২০০৬ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ২০১১ সালের মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ বলা হয়েছে ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৪২ কোটি টাকা অর্থাৎ ৯ হাজার ২৩৩ কোটি ডলার (দেখুন: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪, পৃ: ২৮৫-২৮৬, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অণুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)। আমার হিসেবে ২০০০ সালের স্থির মূল্যে ২০১১ সালে বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ হবে ৬ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ ৮ হাজার ৮৫৫ কোটি ডলার যেটাই লেখচিত্র ৩-এ দেখানো হয়েছে।

[৫১] পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদী সকল দেশসহ আজকের সামাজ্যবাদের কেন্দ্রভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্টে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে যে ব্যাপক জনগোষ্ঠির মধ্যে বৈষম্য-অসমতা ক্রমাগত বাড়ছে এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, জোসেফ স্টিগলিজ, (2013). The Price of Inequality. New York: Penguin Books; পল ক্রুগম্যান. (2013). End this Depression Now. NY: W.W. Norton & Company Ltd; জেফরি স্যাকস. (2012). The Price of Civilization: Reawekening Virture and Prosperity after the Economic Fall. London: Vistage Books; থমাস পিকেটি. (2014). Capital in the Twenty-First Century. (translated by Arthur Goldhammer). Harvard: The Belknap Press of Harvard University; জন পার্কিনস. (2006). Confessions of An Economics Hit Man. The Shocking inside story of how American REALLY took over the world. London: Ebury Press: নোয়াম চমস্কি ও আন্দ্রে ভ্লাটচেক. (2013). On Western Terrorism: From Hiroshima to Drone Warfare. London: Pluto Press.

[৫২] আমার হিসেবে ২০০০ সালের স্থির মূল্যে ২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় ৬ লক্ষ ৭১ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা অর্থাৎ ৯ হাজার ৫৯৭ কোটি ডলার (১ ডলারে ৭০ টাকা হিসেব করা হয়েছে)। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব সাইট অনুযায়ী ১৯৯৫-১৯৯৬ সালের স্থির মূল্যে ২০১১ সালে মোট জাতীয় আয় বলা হয়েছে ৪ লক্ষ ৯৬ কোটি টাকা অর্থাৎ ৬ হাজার ১ কোটি ডলার। ২০০৫-২০০৬ সালের স্থির মূল্যে হিসেব করলে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত ২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৫ হাজার ১৬৯ কোটি টাকা অর্থাৎ ১০ হাজার ৭৪ কোটি ডলার।

এতো গেল মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বিষয়াদি। মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে এর চেয়ে অনেক ভাল পরিমাপক হলো মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় (percapita real national income)। ১৯৭৩ সালে মাথাপিছু প্রকৃত আয় (পিপিপি ডলারে) ছিল মালয়েশিয়ায় ১,৪০০ ডলার আর বাংলাদেশে ৩০০ ডলার (লেখচিত্র ৮)। 'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের (২০১১ সালের) বাংলাদেশে তা ১,৮৯০ ডলার আর মালয়েশিয়ার ১৩,৮২২ ডলার অর্থাৎ মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের ক্ষেত্রে আজকের মালয়েশিয়া আজকের বাংলাদেশের তুলনায় ৭.৩ গুণ বেশি এগিয়ে আছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' আজকের বাংলাদেশে মাথাপিছু প্রকৃত আয় মালয়েশিয়াকে অতিক্রম করে ১৪,১০০ ডলারে দাঁড়াতো অর্থাৎ যেটা আজকের মালয়েশিয়ার তুলনায় মাথাপিছু ২৭৮ ডলার বেশি আর 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় মাথাপিছু ১২,২১০ ডলার (অথবা ৭.৫ গুণ) বেশি (দেখুন, লেখচিত্র ৮)।

লেখচিত্র ৮: মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়: ১৯৭৩-২০১১
(২০০৫ সালের স্থির মূল্যে, পিপিপি ডলারে)

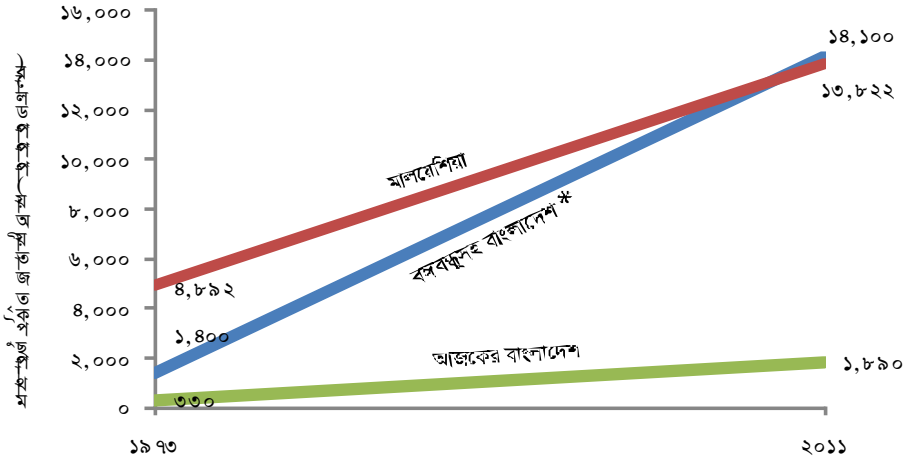

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু হত্যার এইই হলো দীর্ঘমেয়াদী প্রতিফল। পিছিয়ে গেলাম, আমরা অনেক পিছে পড়লাম। এর জন্য কে দায়ী, কি ভাবে দায়ি, কি তারা চেয়েছিলো সে প্রসঙ্গে নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ কিছু বিশ্লেষণ ইতোমধ্যে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে তুলে ধরেছি, আর বাকিটা দায়িত্বশীল-দেশপ্রেমিক-জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ ইতিহাস রচয়িতাসহ সামাজিক বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করবেন। তবে এক্ষেত্রে বিশ্লেষণভিত্তিক আমার উপসংহার হলো এরকম যে, যারা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিলো তারাই বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যের মূল পরিকল্পনাকারী ষড়যন্ত্রকারী; সাম্রাজ্যবাদ– সমাজতন্ত্র বিরোধী তো বটেই এমনকি অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ (secular nationalism) বিরোধী বিধায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদই 'বঙ্গবন্ধুসহ' সোনার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত অভিযান চালিয়েছিল এবং তাদের এ কর্মকাণ্ড এখনও অব্যাহত– এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত; বঙ্গবন্ধুর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে– তা মুক্তিযুদ্ধের আগের বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের ৩৩ বছরে (১৯৩৮-১৯৭১) হোক আর মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সাড়ে তিন বছরে (১৯৭২-১৯৭৫) হোক– যারা তাঁর আদর্শের শত্রু ছিল তারাই ঐ হত্যা পরিকল্পনাকারী; তারা প্রথমে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম থেকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রধান শত্রু ছিল; তারাই মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অসাম্প্রাদায়িক জাতিয়তাবাদের চেতনায় বাংলাদেশকে মাথা তুলে দাঁড়াতে না দেয়ার এজেন্ট, তারাই বাংলাদেশকে মর্যাদাহীন অকার্যকর দরিদ্র দেশ হিসেবে জিইয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল; এবং বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছিল তারা শুধু বঙ্গবন্ধু নামক স্বাধীনচেতা-দেশপ্রেমিক মুক্ত-স্বাধীন দেশ-রাষ্ট্র-সমাজ গঠনের দর্শন প্রণেতা ও তা বাস্তবায়নকারী এক ঐতিহাসিক বিশাল ব্যক্তিত্বকেই হত্যা করেনি, তারা হত্যা করেছে একটি দ্রুত উদীয়মান রাষ্ট্র-সমাজের ভবিষ্যত; এবং হত্যার সময়কাল হিসেবে বেছে নিয়েছে সম্ভাব্য দ্রুততম হারে বৈষম্যহ্রাসসহ অর্থনৈতিক প্রগতির সময়কাল– এ ঐতিহাসিক সময় চয়নটিও গভীরতম এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন মাত্র অর্থাৎ এসব করে তারা হত্যা করেছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দ্রুততম বিকাশের ঐতিহাসিক যুগপর্বকে। আমার হিসেবপত্তরসহ ইতিহাসই তো তার সাক্ষ্য বহন করছে।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উদ্ভাবিত উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়িত হলে আজকের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চেহারার যে আমূল পরিবর্তনের সম্ভাব্যতার কথা এতক্ষণ বিশ্লেষিত হলো তা যথেষ্ট নয়। মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নিমিত্ত

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন (যার অধিকাংশই এ অনুচ্ছেদের 'অনুসিদ্ধান্ত'সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে) বাস্তবায়নের ফলে আমূল পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটতো রাজনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' আর সেই সাথে তার উন্নয়ন দর্শন ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হলে কেমন হতো আজকের বাংলাদেশ সমাজের চেহারা? কেমনটি হতে পারতো শ্রেণি বিভক্ত সমাজের পরিবর্তিত শ্রেণি কাঠামো? আমার হিসেবে যা হতো তার কয়েকটি প্রবণতা-সম্ভাবনা নিম্নরূপ:

ক) ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের ৪৩ বছর পরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সুনামগঞ্জের আব্দুল নূর, বীর প্রতীকের একমাত্র কন্যা (যার জন্ম ১৯৭১ সালে) হোসনে আরাকে রাস্তায় গোবর কুড়িয়ে ঘুটা বানিয়ে বিক্রি করে হাওড়ের জীর্ণ কুটিরে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে হতো না। ঢাকার নওয়াবগঞ্জের শহীদ আমির হোসেন, বীর প্রতীকের একমাত্র কন্যা সেলিনা খাতুনকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) প্রকল্পে কোদাল হাতে মাটি কেটে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো না। মুক্তিযোদ্ধা-সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা-মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবন দিতে প্রস্তুত সহানুভূতিশীল মানুষদের দরিদ্র-বঞ্চিত-শোষিত-নিষ্পেষিত হতে হতো না। বয়োবৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা ভ্যান চালায় আর ভ্যানে বসে রাজাকার সিগারেট ফুকে বলে "এই ব্যাটা মুক্তিযোদ্ধা জোরে চালাতে পারিস না"– এ অবস্থা কখনও হতো না। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের কারণে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক (১৯৭৩ সালে) খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা বা তার স্ত্রী, কন্যা-পুত্র বা এখনও জীবিত পিতা-মাতাদের প্রায় ৫৮ শতাংশ আর্থিকভাবে অসচ্ছল থাকতেন না।[৫৩]

খ) মহান মুক্তিযুদ্ধে ইজ্জতহানি-সম্ভ্রমহানির শিকার ১০ লক্ষ নারীকে যাথাযোগ্য মর্যাদায় সমাজে বসবাসের সকল সুযোগ সৃষ্টি করা হতো।

গ) ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়িত হওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক-মানবিক-চেতনায়ন বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে মানব মুক্তি ও স্বাধীনতা চেতনা-সংশ্লিষ্ট বোধ বৃদ্ধি পেতো এবং তা কার্যকরভাবে দেশ-সমাজ গঠনে নিয়ামক ভূমিকা রাখতো। এসবের ধনাত্মক প্রতিফল হতো অনেক গভীর-বহুমুখী-বহুবিস্তৃত। এবং বংশ পরম্পরা।

ঘ) সংবিধানের ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় শাসন (local governance) উৎসাহিত হতো এবং ঐসকল প্রতিষ্ঠানে কৃষক, শ্রমিক এবং নারীরা যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব করতেন; নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসন ভার অর্পন করা হতো এবং স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রয়োজনে করারোপসহ বাজেট প্রণয়ন ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হতো। এ সবের প্রকৃত অভিঘাত যা দাঁড়াতো তা হল জনগণই হবেন প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত মালিক এবং দেশের উন্নয়ন ও প্রগতি কর্মকাণ্ডে দেশের সাধারণ মানুষের অভিপ্রায়ই নিয়ামক ভূমিকা পালন করতো। আর ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন উন্নয়নে জনগণের প্রকৃত অংশিদারিত্ব বাড়তো অন্যদিকে দুর্নীতি-লুণ্ঠন-পরজীবী প্রকৃতির উন্নয়ন-প্রগতি বিরোধী কর্মকাণ্ড উচ্ছেদ হয়ে যেতো। "মানুষ নিজেই নিজের ইতিহাস রচনা করতেন"– এটাই ছিলো বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের নিহিতার্থ।

ঙ) মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সবার জন্য সব ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান হেতু স্থুল জন্ম হার (crude birth rate) এবং স্থুল মৃত্যুহার (crude death rate)– উভয়ই হ্রাস পেতো। এসবের ফলে দারিদ্র্য-উদ্ভূত মৃত্যুহার বহুগুণ হ্রাস পেতো। জন্ম ও মৃত্যু হার হ্রাস পেলেও আজকের জনসংখ্যা হয়তো বা ১৫ কোটিতেই থাকতো কিন্তু জনসংখ্যায় বড় ধরনের গুণগত পরিবর্তন ঘটতো। যা হতো তা হলো এই ১৫ কোটি জনসংখ্যাটি নিঃসন্দেহে উচ্চতর গুণমান সমৃদ্ধ আলোকিত জনসম্পদে রূপান্তরিত হতো ফলে মানুষের জীবন যাত্রা ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত মানে আমূল পরিবর্তন আসতো। যা দেশজ মেধা-মননের বিকাশসহ দেশজ উৎপাদন-পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার চেহারাটাই পাল্টে দিতো (অন্তত শ্রমের অধিকতর ফলপ্রদতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে)। এ সবের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিফল হতো আজকের বাংলাদেশের তুলনায় অন্য এক বাংলাদেশ বিনির্মিত হয়ে যেতো– যে বাংলাদেশকেই বঙ্গবন্ধু 'সোনার বাংলা' নামে আখ্যায়িত করতেন।

চ) জনসংখ্যা ১৫ কোটি থাকতো তবে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নের ফলে মোট জনসংখ্যায় গ্রামের জনসংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পেতো। গ্রাম তো আর আজকের মত গ্রাম থাকতো না। গ্রামের মানুষ নগরের নাগরিক সমাজের সকল সুবিধা গ্রামে বসেই পেতেন– পেতেন বিদ্যুৎ, পেতেন জ্বালানি সুবিধা, পেতেন সুপেয় পানি ও পয়ঃনিস্কাশন প্রণালির বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক সুবিধাদি, পেতেন বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার সুযোগ, পেতেন আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা,

[৫৩] এসব নিয়ে বিস্তারিত দেখুন জনতা ব্যাংক কর্তৃক গবেষিত ও প্রকাশিত আকর গ্রন্থ "একাত্তরের বীরযোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় জীবনগাঁথা: খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা স্মারকগ্রন্থ", জনতা ব্যাংক লিমিটেড, জুন ২০১২, পৃ: ১-৮।

পেতেন আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ গণযোগাযোগ ও ব্যক্তি যোগাযোগের সকল মাধ্যমে সহজ অভিগম্যতা (অর্থাৎ যাকে বলে PSURA, providing scientific urban amenities in rural areas)। এ সবের ফল দাঁড়াতো একদিকে গ্রামের মানুষের সুস্থ আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লম্ফন। আর অন্যদিকে আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭২ শতাংশ এখন গ্রামে বাস করেন যা মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ (যেখানে ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৯২ শতাংশ একই সময়ে মালয়েশিয়ায় তা ছিল ৬৭.৩ শতাংশ)। উপরের বর্ণিত বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনটি গ্রামের মানুষের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হলে গ্রামের চিত্র আমূল পাল্টে যেতো– সংজ্ঞাগতভাবেই গ্রামকে আর প্রচলিত অর্থের গ্রাম বলা যেতো না এবং গ্রাম-শহরের জনসংখ্যার এখন যে অনুপাতটা আছে (৭২:২৮) অর্থাৎ মোট ১৫ কোটি মানুষের ৭২ শতাংশ গ্রামে বাস করেন আর বাকি ২৮ শতাংশ শহরে বাস করেন সেটা ঠিক উল্টো হতো অর্থাৎ জনসংখ্যায় গ্রাম-শহরের অনুপাতটা হতো ২৫:৭৫– এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে আজকের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে গ্রাম থেকে শহরে যে গলাধাক্কা অভিবাসন হচ্ছে এবং সেই সাথে গ্রাম থেকে শহরে আসা অভিবাসিত এই মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে স্বল্প মজুরিতে কাজ করে প্রথমে দরিদ্র থেকে নিঃস্ব হচ্ছেন আর তারপরে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হচ্ছেন– এই প্রক্রিয়া থাকতো না; কারণ গ্রাম থেকে মানুষ কোন কারণে শহরে আসলেও সে মানুষ অপেক্ষাকৃত জ্ঞান-সমৃদ্ধ সুস্থ-সবল দক্ষ-প্রশিক্ষিত আলোকিত মানুষ হিসেবে নিদেনপক্ষে শিল্পায়নের আওতায় থাকতেন এবং উচ্চতর জীবনমানের অধিকারী হতেন।

ছ) বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট ও গ্রাম-শহরের প্রভেদ দূরীকরণ নিমিত্ত কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসহ (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৬) বঙ্গবন্ধু ঘোষিত (১৯৭৫ সালে) গণমুখী সমবায় আন্দোলন (যার অন্তর্ভুক্ত ছিলো বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রামীণ সমবায়, কৃষক সমবায়, তাঁতী সমবায়সহ ১৯৭২ এর সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গুরত্বক্রম অনুযায়ী রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপায়ের উপর মালিকানার ধরনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরেই সমবায়ী মালিকানার স্বীকৃতি/প্রতিশ্রুতি) ও কল-কারখানায় শ্রমিকের যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে থাকতো না কোনো ভূমিহীন কৃষক, থাকতো না জল-জলায় মালিকানাহীন প্রকৃত দরিদ্র কোনো জেলে, থাকতো না দরিদ্র কোনো মেহনতি শ্রমিক।

জ) বহুমুখী-বহুরূপী দারিদ্র্যের অনেকগুলোর কোনো অস্তিত্বই থাকতো না, দারিদ্যের কিছু কিছু রূপ প্রশমিত হতো এবং আস্তে আস্তে সেগুলোও বিলুপ্ত হতো। বহুমুখী দারিদ্র্যের এসব রূপের মধ্যে আছে আয়ের দারিদ্র্য, ক্ষুধার দারিদ্র্য, কর্মহীনতার দারিদ্র্য, স্বল্প-মজুরির দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, অস্বচ্ছতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিশুদারিদ্র্য, প্রবীণ মানুষের দারিদ্র্য, নারী-প্রধান খানার দারিদ্র্য, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য, ভাসমান মানুষের দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধী মানুষের দারিদ্র্য, 'মঙ্গা' এলাকার মানুষের দারিদ্র্য, বহিঃস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, বস্তিবাসী ও স্বল্প-আয়ের মানুষের দারিদ্র্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, প্রান্তিকতা থেকে উদ্ভূত দারিদ্র্য (অনানুষ্ঠানিক সেক্টর, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, আদিবাসী মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত, 'পশ্চাৎপদ'-পেশা, চর-হাওর-বাওর-এর মানুষ), রাজনৈতিক দারিদ্র্য (রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ না করতে পারার কারণে দারিদ্র্য), রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনাকারীদের প্রতি আস্থাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, মানস-কাঠামোর (mind set) দারিদ্র্য ইত্যাদি।[৫৪]

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধু উদ্ভাবিত উন্নয়ন দর্শন বাস্তব রূপ নিলে উপরে যা যা উল্লেখ করেছি সবকিছুই তেমনটি হতো– কারণ এ সম্ভাবনা বাস্তব, কল্পনাপ্রসূত কিছু নয়। আর সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোটাই সম্পূর্ণ বদলে যেতো। শ্রেণিসমাজের রূপান্তর ঘটতো এ কারণেও যে ১৯৭২ এর সংবিধানের চার মূল স্তম্ভে ছিলো সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ভিত্তিক মানুষে-মানুষে বৈষম্য হ্রাসসহ সমজাতীয় বিষয়াদি নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতি (যা একাধিক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করেছি)।

[৫৪] দারিদ্র্যের বহুরূপ-বহুমুখ এবং সংশ্লিষ্ট কারণ-পরিণামসহ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৪, "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে", পৃ: ৯-২৮, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত লোক বক্তৃতা, ২০১৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অডিটোরিয়াম, ঢাকা: ২২ মার্চ ২০১৪।

আজকের বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোটি কেমন আর কেমনটা হতো ঐ শ্রেণি কাঠামো যদি বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়িত হতো (বঙ্গবন্ধু 'যদি বেঁচে থাকতেন')? এ সংশ্লিষ্ট হিসেবপত্তর কেউ আগে করেছেন বলে আমার জানা নেই। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার হিসেবপত্তরভিত্তিক বর্তমান আর্থ-সামাজিক শ্রেণি

ছক ২: আজকের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো, ২০১১ (মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি)

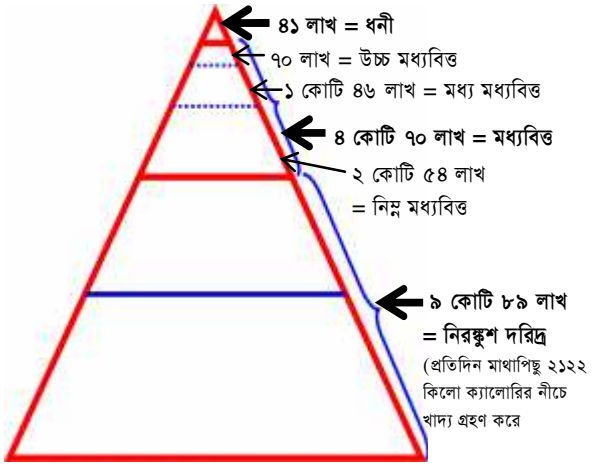

উৎস: আবুল বারকাত, "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে", পৃ: ১৭, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত লোকবক্তৃতা ২০১৪ (ঢাকা ২২ মার্চ ২০১৪। লোকবক্তৃতার ২০১০ সালের শ্রেণি পিরামিডকে ২০১১ সালের জন্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

ছক ৩: 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো ২০১১ সাল নাগাদ কেমন হতো? (মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি)

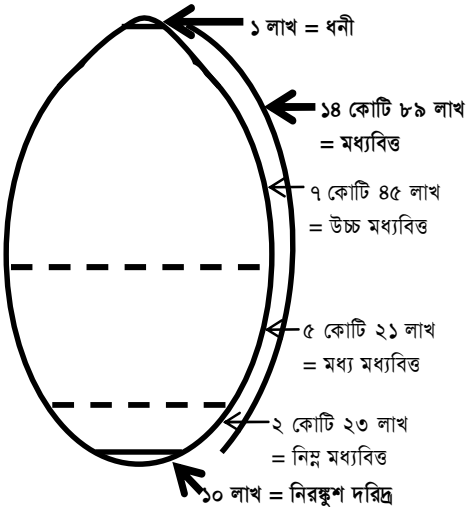

উৎস: প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত

কাঠামো এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন কার্যকরীভাবে বাস্তবায়িত হলে ঐ কাঠামো কেমন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের হতো[৫৫] তা যথাক্রমে ছক ২ ও ছক ৩এ দেখানো হয়েছে।

'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি অতিমাত্রায় শ্রেণিভিত্তিক এবং চরম বৈষম্যমূলক। শুধু তাই নয় এ শ্রেণি বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। বঙ্গবন্ধুহীন বাংলদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর বিকাশ প্রবণতা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আমাদের সার্বিক দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতার অধোগতি হচ্ছে[৫৬]। সেই সাথে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্ন-মধ্যবিত্তের দিকে ধাবিত হওয়া, নিম্ন-মধ্যবিত্তের গতি দরিদ্রমুখী আর সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে কিছু ধনিক শ্রেণির মানুষের হাতে, যারা মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ, আর এদেরই মধ্যে ১০ শতাংশ দখল করে আছে ধনীদের মোট বিত্তের ৯০ শতাংশ বিত্ত-সম্পদ (অর্থাৎ এরা হলো দেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর যে মই সে মইয়ের উপরের ১ শতাংশ মানুষ যাদের বলা হয় super–duper elite)। অর্থাৎ এখানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে জনসংখ্যার অত্যুচ্চ এক শতাংশের এক সমীকরণ যাকে নোবেল বিজয়ী অথনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ আখ্যায়িত করেছেন "Of the 1%, for the 1%, by the 1%," হিসেবে, এমনকি পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অনুরূপ অবস্থা দেখা যায় সর্ব্বোচ ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে সর্ব্বোচ বিত্তশালী ১ শতাংশ আমেরিকান তাদের দেশের মোট বিত্ত-সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের মালিক; যেখানে ক্রমবর্ধমান অসমতা (inequality) এবং সুযোগের অভাব (lack of opportunity) হেতু ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে আর গরীবরা হচ্ছে আরো গরীব[৫৭]।

---

[৫৫] বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর শ্রেণিভিত্তিক আমার হিসেব পত্তর নিয়ে যে কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতা সবারই আছে। তবে ভিন্নমত অথবা দ্বিমত পোষণকারীদের এ বিতর্কে অবতীর্ণ হবার আগে অনুরোধ করবো এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যে তারা বিশ্বাস করেন কিনা যে ১৯৭২ এর সংবিধানে প্রতিশ্রুত সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত তারাই দরিদ্র। আর একই সাথে অনুরোধ করবো মানেন কিনা যে দারিদ্র্যের বহুরূপ আছে, দারিদ্র্য বহুমুখী (যেসব রূপের কথা উপরে 'জ' এ উল্লেখ করেছি)। এসব রূপের যে কোনো একটি বা একাধিক রূপ যার জন্য প্রযোজ্য তিনিই দরিদ্র, আর তার জীবনের অবস্থাটাই দারিদ্র্য।

[৫৬] বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান শ্রেণি বৈষম্যসহ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৪, প্রাগুক্ত পৃ: ১৫-২৮।

[৫৭] এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন জোসেফ স্টিগলিজ, ২০১৩, The Price of Inequality, Penguin Books, পৃ: ix, xi, xiii, xxix-xxxii, xlii-xliii, xliv-xlvii, 1-3, 5, 19, 35,-38; পল ক্রগম্যান, ২০১৩, End This Depression Now, WW. Norton & Company Ltd., পৃ: ৭৪-৮২; নোয়াম চমস্কি, ২০০৩, Hegemony or Survival : America's Quest for Global Dominance, Penguin Books, পৃ: ১৫৯।

'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের ১৫ কোটি মানুষের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোটা নিম্নরূপ (ছক ২ দেখুন) : মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ (অর্থাৎ ৪১ লাখ) মানুষ ধনী আর ১ শতাংশ হবে যাকে বলে সুপার-ডুপার ধনী, ৩১.৩ শতাংশ মধ্যবিত্ত (মোট ৮ কোটি ৭০ লাখ মানুষ), আর ৬৫.৯ শতাংশ নিরঙ্কুশ দরিদ্র (absolute poor, যাদের সংখ্যা ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ)। অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশ সুস্পষ্টভাবে ধনী-দরিদ্রে বিভাজিত। আর আর্থ-সামাজিক শ্রেণি মই-এর অত্যুচ্চ স্থানে অবস্থিত মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ মানুষ অত্যুচ্চ ধনীই শুধু নয় তারা rent seeking-এর বিভিন্ন পথ-পদ্ধতিতে সমগ্র অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করে ফেলেছে; রাজনীতি ও সরকারকে তারা এমনভাবে তাদের অধীনস্থ কব্জাগত সত্তায় রূপান্তরিত করেছে যখন তারাই আসলে চালকের আসনে, যখন তাদের কথায়ই রাজনীতি ও সরকার ওঠাবসা করে। এরা মোট জাতীয় পারিবারিক সম্পদ ও আয়ের (কালো টাকাসহ) ৬০-৭০ শতাংশের মালিক। আর তার বিপরীতে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য (যা বহুমুখী) বেড়েছে ও ক্রমাগত বাড়ছে। 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-সমীকরণটা দাঁড়িয়েছে এমন যে লুটেরা দুর্বৃত্ত, পরজীবী, অনুপার্জিত আয়কারী, অন্যের সম্পদ হরণকারী-আত্মসাৎকারী, ফাও-খাওয়া এই rent seekers গোষ্ঠী সরকার ও রাজনীতিকে তাদের অধীনস্থ করার ফলে বাস্তব উন্নয়ন নীতি-দর্শনটাই এমন যে ধনী আরো ধনী হবে, মধ্যবিত্তের অধোগতি হবে, এবং দরিদ্র মানুষ দরিদ্রতর হয়ে নিঃস্ব হবেন আর তার পরে হবেন ভিক্ষুক (অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে)। এ সবই 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো রূপান্তরের মূলকথা।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর "মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও বৈষম্য হ্রাসকরণ-উদ্দিষ্ট উন্নয়ন দর্শন" কার্যকর হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোটা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও প্রগতিবাদী হতো – এতে আমার কোনই সন্দেহ নেই। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে'এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়িত হলে আজকের ১৫ কোটি মানুষের বাংলাদেশের অর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর আমূল পরিবর্তন-রূপান্তর ঘটে যেমনটি দাঁড়াতো তা নিম্নরূপ (দেখুন ছক ৩, আর তুলনামূলক অবস্থার জন্য লেখচিত্র ১১ দেখুন): আজকের বাংলাদেশে মোট ১৫ কোটি জনসংখ্যার যেখানে ২.৭ শতাংশ ধনী সেটা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে কমে দাঁড়াতো ০.০৭ শতাংশ (অর্থাৎ আজকের ৪১ লক্ষের বিপরীতে মাত্র ১ লক্ষ মানুষ); শ্রেণি কাঠামোর একদম নীচ তলার নিরঙ্কুশ দরিদ্র মানুষের সংখ্যা আজকে যেখানে মোট জনসংখ্যার ৬৫.৯ শতাংশ (মোট ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষ) সেটা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে (আজকের দৃষ্টিতে/এ সময়ে বসে) কল্পনাতীত হ্রাস পেয়ে মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশে দাঁড়াতো (অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হত মাত্র ১০ লাখ); সেইসাথে সংখ্যাগত ও গুণগত দিক থেকে সবচে বড় যে পরিবর্তন ঘটতো সেটা হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে পরিবর্তন রূপান্তর– আজকে মোট জনসংখ্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা ৩১.৩ শতাংশ (মোট ৪ কোটি ৭০ লাখ মানুষ) যা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে প্রায় তিনগুণ বেড়ে মোট জনসংখ্যার ৯৯.৩ শতাংশে উন্নীত হতো (অর্থাৎ মোট মধ্যবিত্তের সংখ্যা হতো ১৪ কোটি ৮৯ লাখ মানুষ)। অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আজকের বাংলাদেশের তুলনায় একদিকে ধনী মানুষের মোট সংখ্যা ৪১ গুণ কমে যেতো, অন্যদিকে নিরঙ্কুশ দরিদ্র মানুষের মোটসংখ্যা প্রায় ৯৯ গুণ কমে যেতো, আর মধ্যবিত্ত মানুষের মোটসংখ্যা ৩.২ গুণ বাড়তো। শুধু তাইই নয় যে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় ধনী ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বহুগুণ হ্রাসের ফলে মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতো সেই সাথে মধ্যবিত্তের মধ্যে যে তিনভাগ আছে অর্থাৎ উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত আসলে এখানেই ঘটতো আমূল কাঠামোগত রূপান্তর। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় উচ্চ মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতো ১০.৬ গুণ (আজকের বাংলাদেশের ৭০ লক্ষ থেকে বেড়ে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে ৭ কোটি ৪৫ লক্ষ মানুষে উন্নীত হতো), মধ্য-মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতো ৩.৬ গুণ (মোট ১ কোটি ৪৬ লক্ষ থেকে বেড়ে ৫ কোটি ২১ লক্ষ মানুষ), আর সংগত কারণেই মধ্যবিত্তের উপর তলায় এত বৃদ্ধির ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা আজকের তুলনায় প্রায় ১৪ শতাংশ হ্রাস পেতো (মোট ২ কোটি ৫৪ লক্ষ থেকে কমে ২ কোটি ২৩ লক্ষ মানুষে দাঁড়াতো)। অর্থাৎ এক কথায় বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন" বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর আমূল প্রগতিবাদী রূপান্তর ঘটতো– এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বাংলাদেশের বিপরীতে মালয়েশিয়া অথনৈতিকভাবে অনেক গুণ বেশি উন্নতি করেছে একথা সত্য তবে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোতে তেমন কোন রূপান্তর ঘটেনি যা বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশে অবশ্যম্ভাবিভাবেই ঘটতো। আর তা ঘটতো "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন" বাস্তবায়নের কারণেই অন্য কোনো অলৌকিক কারণে নয়।

লেখচিত্র ৯: 'বঙ্গবন্ধুহীন' ও 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোতে বিভিন্ন শ্রেণির তুলনামূলক অবস্থা: দু'অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত মোট ১৫ কোটি মানুষের শতকরা হার, ২০১১

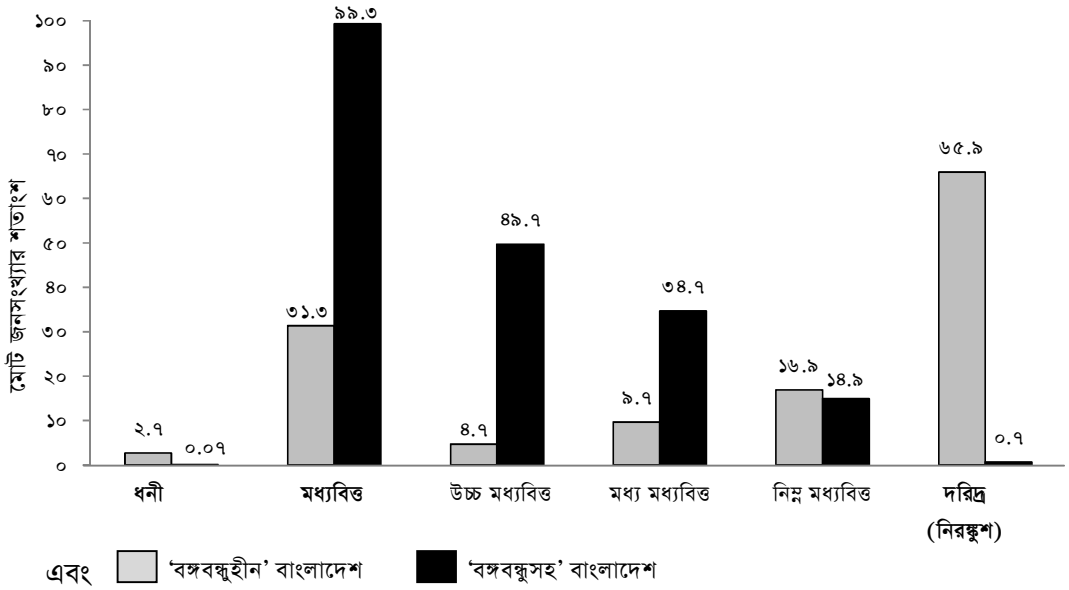

বঙ্গবন্ধুর 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়ন হলে (যার ভিত্তি হিসেবে বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি) বাংলাদেশের অর্থনীতিসহ সমাজের শ্রেণিকাঠামোতে যে আমূল প্রগতিশীল রূপান্তর ঘটতো সে বিষয়ে নিশ্চিত উপসংহারে উপনীত হবার আগে আরো কিছু বিশ্লেষণাত্বক বিষয়াদি উল্লেখ জরুরি। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর প্রগতিশীল পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশকারী আরো কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ:

ক) জাতীয় সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়ের উপর মালিকানা কাঠামোটি সংবিধানিকভাবেই গুরুত্বক্রম অনুসারে যথাক্রমে 'রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী, ও (নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে) ব্যক্তিগত হবে' – প্রতিশ্রুতির কারণে সম্পদের সবচে বেশি অংশের মালিক হতো রাষ্ট্র, তারপর সমবায়[৫৮]। তারপরেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তি। আর এ কারণেই জাতীয় সম্পদের ও উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তি-খানা-পরিবার পর্যায়ে মালিকানাজনিত তেমন কোন বৈষম্য থাকত না।

খ) ব্যক্তিগত-খানা-পরিবার পর্যায়ে জাতীয় সম্পদের যে অংশটুকু থাকতো তা বণ্টন বৈষম্য হ্রাস নীতি অথবা বণ্টন ন্যায্যতার নীতির কারণে শ্রেণি-কাঠামো মই-এর উপরের দিকে পুঞ্জীভূত হবার কোন সুযোগই থাকত না। যেমন ঐ শ্রেণি মই-এর (class ladder) উপরের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ ব্যক্তি-খানা-পরিবার-এর হাতে থাকতো উক্ত সম্পদ ও আয়ের বড়জোর ১৫ শতাংশ (যা এখন ৭০-৮০ শতাংশ) আর শ্রেণি মই-এর সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ-এর হাতে থাকতো উক্ত সম্পদ ও আয়ের ৭-৮ শতাংশ। একই সাথে উল্লিখিত মোট জাতীয় সম্পদ ও খানার আয়ের ৭৭-৭৮ শতাংশ থাকতো ৮০ শতাংশ ব্যক্তি-খানা-পরিবারের হাতে। জাতীয় খানা ভিত্তিক আয়ের চেহারাটাও আমূল পাল্টে অনুরূপ হতো। সুতরাং জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-খানা-পরিবারভিত্তিক তেমন কোন বৈষম্য থাকতো না বললে অত্যুক্তি হবে না।

[৫৮] আমার কাছে সংবিধানে বিধৃত এই সমবায়ের অর্থ অধুনা তথাকথিত 'অংশগ্রহণমূলক' (partnership) উন্নয়ন বলতে যা বুঝানো হয় তা নয়। তথাকথিত "অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন" আসলে নয়া-উদারবাদীদের প্রেসক্রিপশন। এক্ষেত্রে যা বুঝানো হয় তাতে আমি বুঝি সম্পদ-সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বাড়তেই থাকবে আর তারই মধ্যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মেহনতি মানুষ অধিক হারে সম্পৃক্ত হবেন বা অংশগ্রহণ করবেন। আমার কাছে এই 'অংশগ্রহণের' অর্থ "শ্রমিক-কৃষক আরো বেশি কাজ করো, আরো বেশি উৎপাদন করো। আর আমরা মালিকরা যত বেশি পাবো তার অংশ তো চুইয়ে তোমাদের কাছেই যাবে– trickle down হবে। তোমরা আগের চেয়ে ভাল থাকবে। মজুরির আন্দোলন করে অযথা ঝামেলা বাড়িও না। কারখানা বন্ধ হলে তোমাদের কাজ থাকবে না। আর তাতে দেশের মহাক্ষতি হয়ে যাবে"। এই সম্পৃক্ততার বা অংশগ্রহণের মানে দাঁড়ায় উৎপাদনের উপায় ও শ্রমের যন্ত্র-হাতিয়ারের উপর যেমন চাষের জমির উপর প্রকৃত কৃষকের থাকবে বড়জোর অভিগম্যতা (access) মালিকানা (ownership) নয়। এসবই হলো মুক্তবাজার অর্থনীতিকে জিইয়ে রাখার জন্য উদার ও নব্য-উদারবাদী অথনীতিবিদদের এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি (intellectual fraud) যার পেছনে আছে সমাজতন্ত্রসহ অসাম্প্রাদায়িক জাতিয়তাবাদ ঠেকানোর প্রচেষ্টা আর অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের দর্শন এবং যার বাস্তবায়ন দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদেরই প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক ও নীতি-নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাবলু টি ও) আফ্রিকান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংকসহ জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন অংগ প্রতিষ্ঠান, এবং ইদানীংকালের বহু ধরনের 'থিংক ট্যাংক' (Think Tank, মহাচিন্তা-মহাদুশ্চিন্তার ল্যাবরেটরি) কে।

গ) জন্মসূত্রে মানুষের দরিদ্র হবার কোন সুযোগ থাকতো না। বংশ পরম্পরা দারিদ্র্য বলতে কিছু থাকতো না। দরিদ্র হিসেবে যারা থাকতেন (মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশ) তার কারণ হতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (অতিবৃষ্টি, বন্যা, অনাবৃষ্টি, নদী ভাঙ্গন, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস ইত্যাদি) এবং ব্যক্তিগত (শারীরিক, মানসিক ইত্যাদি) কারণে সৃষ্ট অস্থায়ী–স্বল্পকালীন-আপদকালীন (temporary) দরিদ্র অথবা অদরিদ্রের কিছু সময়ের জন্য দরিদ্র হওয়া। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর "মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণভিত্তিক বৈষম্যহ্রাসকারী অর্থনৈতিক নীতি-দর্শন" আর একই সাথে শক্তিশালী ও কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা (strong and efficient social protection system) নীতি-কৌশল অবলম্বনের ফলে স্থায়ীভাবে কারো দরিদ্র থাকার কোন সুযোগই থাকতো না। এবং এটা জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ-বয়স-পেশা নির্বিশেষে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হতো।

৬। তাহলে মূল কথা যা দাঁড়ালো: উপসংহার

এ প্রবন্ধের মূল বিষয়– কেমনটি হতো আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা যদি বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকতেন' এবং সেইসাথে যদি বঙ্গবন্ধুর "স্বদেশ মাটি উত্থিত বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়ন দর্শন" বাস্তবায়িত হতো? এ প্রশ্নের বস্তুনিষ্ঠ ও নির্মোহ সম্ভাব্য উত্তর অনুসন্ধানে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিষয়াদির বিশদ বিশ্লেষণের কোনো বিকল্প ছিল না। 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি মাত্রা কেমন হতে পারতো তা নিরূপণ করার আগে প্রথম ৪ অনুচ্ছেদে বিভিন্ন-ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে যার অন্যতম ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব ইতিহাসের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যসমূহ, মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজে ক্ষয়-ক্ষতির প্রভাব-অভিঘাতসহ মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বঙ্গবন্ধু ১৩১৪ দিনে (অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫) 'সোনার বাংলার' ভিত গঠনে যা করেছিলেন তার বিশ্লেষণ। আর এসব কিছুর নিরিখে বঙ্গবন্ধু উদ্ভাবিত উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্ত অবলম্বনে বিভিন্ন হিসেব-পত্তের ভিত্তিতে পঞ্চম অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কতদূর যেতো– এ বিষয়টি। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণভিত্তিক এ প্রবন্ধের মূল কথা যা দাঁড়ালো সেগুলি নিম্নরূপ:

ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবনটা যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত মাত্র ৫৫ বছরের (১৯২০-১৯৭৫) । তার মধ্যে সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন আনুমানিক ৩৭ বছর– মুক্তিযুদ্ধের আগে প্রায় ৩৩ বছর আর মুক্তিযুদ্ধের পরে (১৯৭২ এর ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত) মাত্র সাড়ে তিন বছর (১৩১৪ দিন)। ১৯৭২ এর মহান মুক্তিযুদ্ধপূর্ব সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের ৪০ শতাংশ সময় বঙ্গবন্ধু জেলে জেলে কাটিয়েছেন। আর ৪৮ শতাংশ সময় ব্যয় করেছেন মানুষের সাথে জীবন্ত যোগাযোগ রক্ষা করে সংগঠন গড়ে তোলাসহ মাঠের আন্দোলন-সংগ্রামে, ঘুমিয়েছেন মাত্র ১২ শতাংশ সময় (দিনে গড়ে ৩-৩.৫ ঘণ্টা)। কারণ একটিই– তা হলো নিখাদ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের (পূর্ব পাকিস্তানের) ন্যায্য অধিকার আদায়ের ও জনগণের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে ছিলেন অনড়-অটল-অবিচল বিশ্বস্থ। দেশ-বিদেশের কোনো শক্তি বঙ্গবন্ধুকে এ প্রশ্নে নিম্নতম মাত্রায় কক্ষচ্যুত করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষের– জনগণের অন্তর্নিহিত অসীম সুপ্ত শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জনগণ এবং কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করতে সক্ষম– নেতৃত্ব সেখানে উপলক্ষ মাত্র। যে কারণেই বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিটি ছিলেন মানুষের প্রতি নিঃশর্ত আস্থা, বিশ্বাস, ভালবাসা, মমত্ববোধ, সহমর্মিতা, মহানুভবতাসহ দেশপ্রেমের যত রূপ আছে সবকিছুর একীভূত বিরল সত্তা। যে কারণেই মানুষের বিশেষত দুঃখী মেহনতী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর প্রশ্নে রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে আপোষহীন– তা মুক্তিযুদ্ধের আগেই হোক বা মুক্তিযুদ্ধের পরেই হোক। আন্দোলন-সংগ্রামের এ প্রক্রিয়ায় শেখ মুজিবুর রহমান দিন-রাত মাঠে-ঘাটে রাজনীতির সাধারণ কর্মী থেকে ধাপে ধাপে রূপান্তরিত হন 'বঙ্গবন্ধু'তে তার পর 'বঙ্গবন্ধু' থেকে 'জাতির পিতা'য়। জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম এবং তার ফসল ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং পরবর্তীকালে মুক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র-সমাজ গঠনে অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড– এ প্রক্রিয়ার পুরো সময়টাতেই (অর্থাৎ তার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের ৩৭ বছর) তিনি সবসময়ই বিদেশি-দেশি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যবস্তু ছিলেন। বঙ্গবন্ধু বিরোধী, বঙ্গবন্ধুর দর্শন বিরোধী, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গঠনের বিপক্ষ শক্তির, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর বিপক্ষ শক্তির, সমাজতান্ত্রিক

সমাজব্যবস্থা গড়ার বিরুদ্ধ শক্তির, অসাম্প্রদায়িক জাতিয়তাবাদ বিরোধী শক্তির এ ষড়যন্ত্র চূড়ান্তভাবে কার্যকর হলো ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাসের বর্বরতম নৃশংসতম হত্যার মাধ্যমে। এ হত্যা শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর মত ইতিহাসে একজন বিরলপ্রজ ব্যক্তিকে হত্যা নয়– এ হত্যা একটি স্বাধীন জাতির সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ-আলোকিত ভেদহীন জাতিতে রূপান্তরের স্বপ্নের হত্যা।

খ) বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন ছিলো এ দেশের গণমানুষের সুখ-সমৃদ্ধি (well-being অর্থে) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন (deeprooted humane philosophy towards people's well-being)। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন দর্শনের ভিত্তি-শক্তি ছিল গণমানুষ। আর ঐ বিশ্বাস যে জনগণ এবং কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে। আর তার উন্নয়ন দর্শনটি ঐ রাজনৈতিক জীবন দর্শনেরই প্রতিফলন। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে যে, উন্নয়ন হবে মানুষের ন্যায্য-ন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তি-ভিত্তিক স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী (rights based liberty and freedom-mediated process) একটি প্রক্রিয়া যেখানে সবার জন্য, বিশেষত গরীব-দুঃখী মেহনতী মানুষের জন্য পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে। যার মধ্যে থাকবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি, স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা, এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা-সুরক্ষার স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনটি তারই উদ্ভাবিত ও ধারণকৃত "দেশের মাটি উত্থিত অথবা স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শন" (Home grown development philosophy), যে দর্শন অনুযায়ী প্রকৃত উন্নয়ন হলো, এমন এক প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় নির্মিত হবে সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ-ভেদ-বৈষম্যহীন-আলোকিত মানুষের সংঘবদ্ধ-সংহতিপূর্ণ সমাজ ও অর্থনীতি ব্যবস্থা।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনে বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও সমাজ বিনির্মাণের বিষয়টি ছিল অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। এ দর্শনে একই সাথে অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ-বয়স-পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার বিষয়টি। বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন ভিত্তির অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলো– নীতি-নৈতিকতার নিরিখে সকল মানুষ মানুষ হিসেবে সমান। যে কারণে ১৯৭২ এর সংবিধানে "জনগণ এবং কেবলমাত্র জনগণই সার্বভৌম" (জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক, সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭) এই ভিত্তি দর্শন অবলম্বনে চার মূল স্তম্ভ– গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র– সমুন্নত রেখে দেশ পরিচালন তথা উন্নয়ন ভাবনার অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অঙ্গিভূত করা হয়। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের বৈশিষ্ট্য হলো বৈষম্যহীন এক অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র গঠন এবং সেই সাথে অসাম্প্রদায়িক (secular) মানস কাঠামো বিনির্মাণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা। এ উন্নয়ন দর্শনে নতুন সমাজব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু উদ্ভাবিত ও বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ধারণ-লালনকৃত দেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতেই বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন এমন এক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে যে বাংলাদেশে জন্মসূত্রে কেউ দরিদ্র থাকবে না, যে বাংলাদেশে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি হবে চিরস্থায়ী, যে বাংলাদেশ হবে চিরতরে ক্ষুধামুক্ত-শোষণমুক্ত, যে বাংলাদেশ হবে বঞ্চনামুক্ত-সমতাভিত্তিক-অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশে মানবমুক্তি (liberty অর্থে) নিশ্চিত হবে– হবে তা সুসংহত ও সুদৃঢ়, যে বাংলাদেশে নিশ্চিত হবে সকল মানুষের সুযোগের সমতা, যে বাংলাদেশ পরনির্ভরশীল হবে না– হবে স্বনির্ভর-স্বয়ংসম্পন্ন; যে বাংলাদেশ হবে 'সোনার বাংলা'। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন দর্শনসহ এই উন্নয়ন দর্শন শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপ নেবার আগেই বিদেশি-দেশি বঙ্গবন্ধু দর্শন বিরোধী চিরস্থায়ী শত্রুরা দেশ স্বাধীন হবার আগে যেমন ষড়যন্ত্র করেছে তেমনি দেশ স্বাধীন হবার পরে ষড়যন্ত্রের গতি বৃদ্ধি করে স্বাধীন বাংলাদেশকে পশ্চাৎমুখী একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুকে (পরিবার-পরিজনসহ) হত্যা করেছে। এবং গুরুত্বপূর্ণ হলো এই যে বঙ্গবন্ধু হত্যার মূল পরিকল্পনাকারীরা ঠিক সেই সময়টাকে বেছে নিয়েছিল যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু তারই উদ্ভাবিত উন্নয়ন দর্শন প্রয়োগে প্রগতিমূখী-উন্নয়নমুখী (take off) করে গড়ে তুলছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি ঘোষণা করছিলেন (হত্যার মূল পরিকল্পনাকারীরা এখনো ইতিহাসে অনুদঘাটিতই রয়ে গেছে– আংশিক উদ্ঘাটিত হয়েছে তারা যারা ঐ পরিকল্পনার বাস্তবায়নকারী)। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ভবিষ্যত বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে ইতিহাসের একটা শিক্ষার কথা মনে রাখা সঙ্গত হবে: বিষয়টি হলো বঙ্গবন্ধু বলতেন "মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ", তবে সে মানুষের কেউ যদি মোশতাক-তাহেরউদ্দিন ঠাকুর-মাহবুবুল আলম চাষী-জিয়াউর রহমান রাজাকার-আলবদর-আলশামস হয় সেক্ষেত্রে ঐ ধরনের অমানুষের প্রতি বিশ্বাস হবে আত্মঘাতি– শুধু ব্যক্তির জন্য নয় সমগ্র জাতির ভাগ্যের জন্যও।

গ) মুক্ত-স্বাধীন-ক্ষুধামুক্ত-শোষণমুক্ত-বৈষম্যহীন-অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুই সর্বপ্রথম বুঝেছিলেন যে স্বৈর-সেনা-সামন্তশাসিত পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে থেকে ঐ স্বপ্ন বাস্তবায়ন অসম্ভব। যে কারণে জেল-জুলুম-হুলিয়া-নির্যাতন-নিবর্তন থেকে শুরু করে পাকিস্তানের কারাগারে (যখন তারই সামনে তারকবর পর্যন্ত খনন করা হয়েছিল) থাকা অবস্থাতেও তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে ছিলেন পূর্ণমাত্রায় সচেতন, বিশ্বস্ত এবং আপোষহীন। তিনি ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে জনগণকে আহবান করলেন আর জনগণ তারই ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মাত্র ৯ মাসের মধ্যেই দেশ স্বাধীন করলো। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা দিলেন আর আমরা তা রক্ষা করতে পারলাম না।

ঘ) একদিকে জনসংখ্যা বেশি হবার পরও পাকিস্তানের স্বৈর-সেনা-সামন্ত আধা-ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে ২৩ বছরের শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্যের কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের (অর্থাৎ 'আজকের বাংলাদেশের') মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ছিল কম আর অন্যদিকে পাকিস্তান কর্তৃক আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া অন্যায় যুদ্ধে (যার মোকাবেলায় আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে পরবর্তী পর্যায়ে সশস্ত্র হয়েছিলাম) পাকিস্তানিদের 'পোড়ামাটি নীতি'র কারণে যুদ্ধবিধ্বস্ত সকল ধরনের অর্থনৈতিক অবকাঠামো (রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বিদ্যুৎকেন্দ্র ইত্যাদি) এবং পারিবারিক অবকাঠামো ধ্বংসপ্রাপ্তিসহ (প্রায় তিন কোটি মানুষ সর্বস্বান্ত হন) ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ (যাদের মধ্যে ২৫ লক্ষ গ্রামের যুবক ও কর্মক্ষম জনশক্তি, যাদের বেশির ভাগই গ্রামের দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসা এবং যাদের বৃহৎ অংশ ছিলেন পরিবারের একমাত্র কৃষিজীবী মানুষ) হবার ফলে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে কৃষি-শিল্পে মেহনতি মানুষের সংখ্যা হ্রাস পায় যার প্রত্যক্ষ ফল হলো পাকিস্তান আমলে বৈষম্যজনিত কারণে অপেক্ষাকৃত মাত্রার স্বল্প মোট দেশজ উৎপাদন স্বল্পতর হয়ে গেলো। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলো যখন তার সমস্ত মেধা-মনন, জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দেশপ্রেম, সততা দিয়ে তিনি তারই উদ্ভাবিত উন্নয়ন দর্শন প্রয়োগ করে কল্পনাতীত স্বল্পসময়ের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি, সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসনের নির্মাণ-পুনঃনির্মাণ, গঠন-পুনঃগঠন, পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করলেন। এক্ষেত্রে মাত্র ১৩১৪ দিন দেশ পরিচালনায় অগ্রাধিকারক্রম ও কর্মধাপ (priority and sequencing) বিবেচনা বিশ্লেষণে বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টিসহ রাষ্ট্র নায়কের পরিচয়টা স্পষ্ট প্রতীয়মান। তবে ঠিক যে সময়ে বঙ্গবন্ধু তার দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করে (১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে জনসভার ভাষণে) সমাজতন্ত্রের কথা আরো জোর দিয়েই বলা শুরু করলেন, দুর্নীতিবাজদের উত্থান ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের ডাক দিলেন, শর্তাধীন বৈদেশিক সাহায্য না নেবার কথা আরো দৃঢ়তার সাথে বলা শুরু করলেন (বললেন, তিনি ভিক্ষুক জাতির নেতা হতে চান না), ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থা পাল্টে নতুন সমাজব্যবস্থার ভিত্তি শক্তিশালী করার কথা আরো উচ্চ স্বরে বলা শুরু করলেন, গ্রামে গ্রামে বাধ্যতামূলকভাবে বহুমুখী সমবায় গঠনের কথা বললেন, শিক্ষিত সমাজসহ আমলা-বুদ্ধিজীবীদের মন-মানসিকতার দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করে চরিত্র শুদ্ধির তাগাদা দিলেন, যুবসমাজকে ফুলপ্যান্ট ছেড়ে হাফপ্যান্ট পরে বহুমুখী সমবায়ে কাজ করার তাগিদ দিলেন, ঔপনিবেশিক বিচারব্যস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা আরো দৃঢ়তার সাথে বললেন, এবং আন্তর্জাতিক বাজারে গরীব দেশের বিরুদ্ধে ধনীদেশের ব্যবসায়ী মারপ্যাচের বিষয়াদি উল্লেখ করলেন– তখন থেকেই একদিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আর অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানসহ ঐ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দালাল-দোসরদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী তথা বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন বিরোধী যৌথ পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড অতীতের তুলনায় আরো অনেক বেশি দ্রুততার সাথে ও কার্যকরভাবে জোরদার হতে থাকলো। প্রতিবিপ্লবীদের জয় হলো ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট পরিকল্পিতভাবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে। এরপর থেকে শুরু 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের উল্টো পথে যাত্রা। এখান থেকেই শুরু আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার অকাল মৃত্যু।

ঙ) বঙ্গবন্ধু হত্যার পরবর্তী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ধরে উল্লিখিত প্রতিক্রিয়াশীল যৌথ শক্তির উদ্যোগে লাগাতার সেনাশাসন, স্বৈরতন্ত্র, সেনাশাসনের মোড়কে গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী শক্তি তোষণ-পোষণ, ধর্মীয় মৌলবাদের রাজনীতি ও অর্থনীতির বাড়বাড়ন্ত– এসবই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড করে সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই তার বিপরীতে অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করলো। এ ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি শুধু পুনর্বাসিতই হয়নি তারা ২০-২৫ বছরে এমন এক ব্যবস্থা-কাঠামো সৃষ্টি করেছে যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশ পরিচালনের দায়িত্বে যে বা যারাই থাকুন না কেনো প্রকৃত চালকের আসনে শক্তভাবে জেঁকে বসেছে তারা যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না– যারা অন্যের সম্পদ হরণ, দখল, বেদখল,

জবরদখল, আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে rent seeker (লুটেরা, পরজীবী, ফাও খাওয়া শ্রেণি, দুর্বৃত্ত) গোষ্ঠী মাত্র; এবং এই rent seeker গোষ্ঠী এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে যেখানে সরকার ও রাজনীতি তাদেরই কথায় ওঠাবসা করে। এটাই ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রকৃত সত্য ভাষ্য যা অস্বীকার করলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন ধারণ করে ভবিষ্যতে এগুনো দুরূহ হবে।

চ) এতো গেল ১৯৭৫ পরবর্তী 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের বিগত প্রায় চার দশকের কথা। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' আর সেইসাথে বঙ্গবন্ধু উদ্ভাবিত উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়িত হলে ' বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সামাজিক প্রগতি কোথায় গিয়ে ঠেকতো? এ প্রশ্নের উত্তরে বেশ কিছ যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্ত ব্যবহার করে অর্থনীতির কয়েকটি চলকের (macroeconomic variable) সম্ভাব্য পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে এবং তা একদিকে তুলনা করা হয়েছে ' বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের বাংলাদেশের সাথে আর অন্যদিকে 'আজকের মালয়েশিয়ার' সাথে। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে তুলনীয় হিসেবে ধরার পিছনে কয়েকটি যুক্তি কাজ করেছে: (১) পথ চলার শুরুর দিকে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া উভয় দেশেই মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয় প্রায় সমান ছিলো (যদিও মালয়েশিয়ার জনসংখ্যা ছিলো, বাংলাদেশের তুলনায় ৬.৫ গুণ কম, অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে 'মাথাপিছু' দেশজ উৎপাদন ও আয় আমাদের তুলনায় মালয়েশিয়ার ৬.৫ গুণ বেশি হবার কথা); (২) বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া উভয় দেশেরই ১৯৭৩ এ পথচলার শুরু জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে; (৩) বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া উভয় দেশেরই পথচলা শুরু 'দেশজ উন্নয়ন দর্শন' অবলম্বন করে (তবে মৌলিক পার্থক্য যেখানে তা হল বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছিলেন আর মালয়েশিয়ার ড. মাহাথির মোহাম্মদ সে পথে যাননি)। ' বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের আজকের অর্থনীতির অবস্থা কেমন হতো তা নিরূপণের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর কি ধরনের সম্ভাব্য পরিবর্তন-রূপান্তর ঘটতো সেটাও নিরূপণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

আমার হিসেবপত্তর স্পষ্ট নির্দেশ করে যে অর্থনীতির প্রধান মানদণ্ডসমূহের নিরিখে 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি আজকের মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে অনেক গুণ ছাড়িয়ে যেতো এবং সেইসাথে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের বৈশিষ্ট্যের কারণেই আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটে শ্রেণী বৈষম্য হ্রাস পেয়ে সমাজ সমতাভিমুখী হতো যা মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং একইসাথে 'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের বাংলাদেশে যা চরম বৈষম্যমূলক (যে কারণে আমি বলি যে বৈষম্যপূর্ণ দুই অর্থনীতির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা লড়াই-সংগ্রাম-মুক্তিযুদ্ধ করলাম আবারও সেই বৈষম্যপূর্ণ দুই অর্থনীতির ফাঁদে পড়েছে আজকের বাংলাদেশ)। 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) হতো ৪২ হাজার ১৫৮ কোটি ডলার যা একই সময়ের মালয়েশিয়ায় ১৫ হাজার ৪২৬ কোটি ডলার অর্থাৎ মালয়েশিয়ার তুলনায় ২.৭৩ গুণ বেশি এবং একই সময়ের 'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের বাংলাদেশের তুলনায় ৪.৭৬ গুণ বেশি। 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের বাংলাদেশে মাথাপিছু জিডিপি মালয়েশিয়াকে অতিক্রম করতো (যদিও বা একই সময়ে মালয়েশিয়ার জনসংখ্যা আমাদের তুলনায় ৪ গুণ কম)– আমাদের মাথাপিছু জিডিপি হতো ৬,০৬১ ডলার যা মালয়েশিয়ায় ৫,৩৪৫ ডলার। মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) ক্ষেত্রেও 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের বাংলাদেশ মালয়েশিয়াকে ২.৮ গুণ অতিক্রম করতো। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় হতো ৪২ হাজার ৫১৪ কোটি ডলার বিপরীতে এখন মালয়েশিয়ার মোট জাতীয় আয় ১৫ হাজার ৫ কোটি ডলার। এক্ষেত্রে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় হতো ৫,৫৯৮ ডলার যা মালয়েশিয়ায় একই সময়ে ৫,১৯৯ ডলার। প্রকৃত অর্থে তুলনীয় পিপিপি ডলারে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপনের অপেক্ষাকৃত শ্রেয় মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় (পিপিপি ডলারে) এখন হতো ১৪,১০০ ডলার যা মালয়েশিয়ায় ১৩,৮২২ ডলার, আর 'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের বাংলাদেশে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় মাত্র ১,৮৯০ ডলার (অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের তুলনায় প্রায় ৭.৫ গুণ কম)। অর্থনীতির মূল চলকসমূহের নিরিখে 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের বাংলাদেশ আজকের মালয়েশিয়াকে শুধুমাত্র অতিক্রম করতো তাইই নয় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের সমতাভিমুখী বৈশিষ্ট্যের কারণে তা হতো প্রগতিশীল বৈষম্যহ্রাসকারী মাথাপিছু উৎপাদন অথবা বৈষম্যহ্রাসকারী মাথাপিছু প্রকৃত আয়।

ছ) বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং সেইসাথে বঙ্গবন্ধুর প্রগতিবাদী উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর আমূল পরিবর্তন-রূপান্তর ঘটে যেতো। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে মোট ১৫ কোটি জনসংখ্যার মাত্র ০.০৭ শতাংশ হতো ধনী যা 'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের বাংলাদেশে ২.৭ শতাংশ (এ গ্রুপে

জনসংখ্যার ১ শতাংশ অত্যুচ্চ ধনী বা super duper rich আছেন যারাই আজ অর্থনীতি-রাজনীতি-রাষ্ট্র-সরকার সবকিছুরই মূল নিয়ন্ত্রণকারী), আর মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশ থাকতো দরিদ্র মানুষ ('বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে এখন মোট জনসংখ্যার ৬৫.৯ শতাংশ বহুমুখী দরিদ্র) যারা বংশপরম্পরা বা চিরস্থায়ী দরিদ্র হতেন না– হতেন অস্থায়ী-স্বল্পকালীন-আপদ-বিপদকালীন দরিদ্র। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে একদিকে ধনীর সংখ্যা এখনকার তুলনায় ৪১ গুণ কমে যেতো, দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমে যেতো প্রায় ৯৯ গুণ, আর অন্যদিকে বেড়ে যেতো মধ্যবিত্ত গ্রুপে মানুষের সংখ্যা যা এখন মোট জনসংখ্যার ৩১.৩ শতাংশ তা দাঁড়াতো মোট জনসংখ্যার ৯৯.৩ শতাংশে। এক্ষেত্রে গুণগত যে পরিবর্তনটা হতো তা হলো উচ্চ-মধ্যবিত্তের আপেক্ষিক সংখ্যা এখনকার মোট জনসংখ্যার ৪.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াতো ৪৯.৭ শতাংশে, মধ্য-মধ্যবিত্তের সংখ্যা এখনকার ৯.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াতো ৩৪.৭ শতাংশে, আর নিম্ন-মধ্যবিত্তের সংখ্যা এখনকার ১৬.৯ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়াতো ১৪.৯ শতাংশে। অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে প্রকৃত অর্থেই সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য থাকতো না, মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ শতাংশই হতো উচ্চ-মধ্যবিত্ত (৫০ শতাংশ) ও মধ্য-মধ্যবিত্ত (৩৫ শতাংশ), আর দরিদ্র মানুষ বলতে তেমন কেউই থাকতো কিনা সন্দেহ। কারণ এ গ্রুপে আজকের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশ কমে দাঁড়াতো ০.৭ শতাংশে, সেটাও আবার অস্থায়ী-স্বল্পকালীন-আপদকালীন দরিদ্র মানুষ। বঙ্গবন্ধুর প্রগতিবাদী উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নের ফলে একদিকে যেমন মানুষের জন্মসূত্রে অথবা বংশপরম্পরা অথবা পেশাগত অথবা ধর্ম-বর্ণ-জাতি গোষ্ঠীগত দরিদ্র হবার কোনো সুযোগই থাকতো না, আর অন্যদিকে সম্পদ আর্থ-সামাজিক শ্রেণি মই-এর উপরতলায় ধাবিত-প্রবাহিত-পুঞ্জীভূত হবারও কোনো সুযোগ থাকতো না।

তথ্যপঞ্জি

আহমেদ,সিরাজ উদদীন. (২০১১). *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

ইমাম,এইচটি.(২০১১). স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু। নুহ-উল-আলম লেনিন কর্তৃক সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ "*ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু*"। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, আগস্ট ২০১১।

ইসলাম, মযহারুল. (১৯৯৩)*বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* (পরিমার্জিত সংস্করণ)।

বারকাত, আবুল, (২০১২). *বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি*। জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা ২৬ জুন ২০১২। ঢাকা।

বারকাত, আবুল. (২০০৯). *বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন*।বাংলাদেশ সরকারের সমবায় অধিদপ্তর আয়োজিত ৩৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে রচিত মূল প্রবন্ধ০৭ নভেম্বর ২০০৯, ঢাকা।

বারকাত, আবুল. (২০১৪). *বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে*। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত লোকবক্তৃতা ২২ মার্চ ২০১৪। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

রহমান, শেখ মুজিবুর. (২০১২). *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ।

রহমান, ড. মো. মাহবুবুর (২০১১) বঙ্গবন্ধুর শাসনামল ।নূহ-উল-আলম লেনিন কর্তৃক সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ "*ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু*" বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, আগস্ট ২০১১।

খান, মিজানুর রহমান. (২০১৪) *মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (সর্বশেষ সংশোধনিসহ মুদ্রিত, অক্টোবর ২০১১), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এ প্রবন্ধ রচনায় আমাকে অনেকেই অনেকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তবে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে গবেষকের নৈতিক-মানসিক দায়বদ্ধতা অস্বীকার করা হবে। তাদের মধ্যে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছে। তার সাথে ব্যক্তিগত কথোপকথনের বিভিন্ন সময়ে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি এমন অনেক কিছুই জেনেছি, যেমন বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবন, গ্রেফতারি জীবন, জেলখানার জীবন, জেল থেকে বের হয়ে কিছুকাল বাড়ি ফিরে আসার পরের কিছু ঘটনাবলী, শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার ১৯৭৫ সালে বেঁচে যাবার ইতিহাসসহ বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার কিছু ঘটনা। এসবই বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশ কেমন হতো সে চেহারা বিনির্মাণে অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়েছে। রাজনীতিবিদ জনাব তোফায়েল আহমদ-এর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এ জন্য যে তিনি আমাকে তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমার এ প্রবন্ধের চতুর্থ অনুচ্ছেদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ১৯৭২ সালের কিছু তথ্য যথাদ্রুত সরবরাহ করেছেন। আরো দুজন রাজনীতিবিদের নাম না বললেই নয়– ড. নূহ-উল-আলম লেনিন ও জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত যারা প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। মানব উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (এইচডিআরসি) আমার গবেষণা সহযোগী আসমার ওসমান ও ফয়সল এম আহমেদ আমাকে পরিসংখ্যানিক তথ্যাদি সরবরাহসহ 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট সিমুলেশন মডেলে হিসেব-পত্তর প্রস্তুতে সহায়তা করেছেন, মূল পাণ্ডুলিপি বেশ কয়েকদফা টাইপে সহযোগিতা করেছেন মোজাম্মেল হক ও কবিরুজ্জামান এবং আমার মূল পাণ্ডুলিপি টাইপের পরে একাধিকবার পাঠ করে ভুলত্রুটি সংশোধনে সহায়তা করেছেন সেলিম রেজা– আমি ওদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। বাংলা বানানসহ ভাষাগত কিছুদিক দেখে দেবার জন্য আমি জনাব কুয়াত ইল ইসলাম এর প্রতি কৃতজ্ঞ। সবশেষে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাদের কাছে যারা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে গবেষণা করেছেন, বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সময়ের ভাষণ-বক্তৃতা সংকলন করেছেন এবং যাদের গ্রন্থ আমি ব্যবহার করেছি (তাদের সকলের নাম প্রবন্ধের পাদটিকায় উল্লেখ করা হয়েছে)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার(২০১৪).*বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা২০১৪* । অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অণুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ।

সুফী, মোতাহার হোসেন. (২০০৯). *ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক* (দ্বিতীয় সংস্করণ) । ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনা ।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড (২০১২).*একাত্তরের বীরযোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় জীবনগাঁথা: খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা স্মারকগ্রন্থ* । ঢাকা: জনতা ব্যাংক লিমিটেড ।

মিজান, মিজানুর রহমান (সম্পাদিত). (১৯৮৯). *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ* । ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন ।

CAPRA, FRITJOF. (1988). *The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture*. New York: Bantam Books.

CHOMSKY, N.(2003). Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance, NY: Penguin Books.

CHOMSKY, N. AND VLTCHEK, A. (2013). *On Western Terrorism: From Hiroshima to Drone Warfare*. London: Pluto Press.

FAALAND, J. AND PARKINSON, J. R. (1977).*Bangladesh: The Test Case of Development*. New Delhi: S. Chand & Company Ltd.

KRUGMAN, P. (2013). *End this Depression Now*. NY: W.W. Norton & Company Ltd.

PERKINS, J. (2006). Confessions of An Economic Hit Man. The Shocking inside story of how American REALLY took over the world.London: Ebury Press.

PIKETTY, T.(2014).Capital in the Twenty-First Century. (Goldhammer, A. Trans.). Harvard: The Belknap Press of HarvardUniversity.

SACHS, J. (2012). The Price of Civilization: Reawekening Virture and Prosperity after the Economic Fall. London: Vintage Books.

STIGLITZ, J. E.(2013). *The Price of Inequality*.New York: Penguin Books.

UBAN, S.S. (2014). Phantoms of Chittagong: The "Fifth Army" in Bangladesh. (Khan, Hossain Ridwan Ali. Trans.). ঢাকা: ঘাস ফুল নদী ।